বিকালের রঙ

আনন্দ বাগচী

বিহার সাহিত্য ভবন (প্রাইভেট) লিঃ
৩, ভবানী দত্ত লেন ॥ কলিকাতা - ৭

গত বছর শারদীয় সংখ্যা স্বস্তিকায় এই উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হয়েছিল 'অহল্যার স্বপ্ন' নাম দিয়ে। তাকেই আদ্যন্ত অদল-বদল করে নতুন চেহারা এবং নতুন নাম দেওয়া হল।

উপন্যাসের ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রী সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

লেখকের অন্যান্য বই :

চকখড়ি

স্বগত সন্ধ্যা

তেপান্তর [যন্ত্রস্থ]

পরমপ্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র মৈত্র

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মৈত্র

সমীপেষু

এক

তমালের রঙ দেখা নেই তবু এই মেঘাকীর্ণ আকাশের সঙ্গে বুঝি একমাত্র তমাল বনেরই তুলনা চলে!

পিঠের নিচে গোটাদুয়েক বালিশ দিয়ে প্রায় বসার ভঙ্গীতে শুয়ে ছিল শোভন। জানলা দিয়ে লাল মরচে-রঙ খোয়াইয়ের দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ চোখে পড়ে। এক প্রান্তে নীল কাজলের মত শাল-পিয়ালের জঙ্গলের ঝাপসা চেহারা। ডুবু ডুবু বেলায় আকাশে হঠাৎ কালির দোয়াত উল্টে পড়েছে যেন।

অলস ভঙ্গীতে শুয়ে শুয়ে এই মেঘের ঘনঘটা আয়োজন দেখতে মন্দ লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, এই মেঘ, এই কলকোলাহল, সব মুছে গিয়ে পদাবলীর নিসর্গরাজ্য জেগে উঠেছে। শাঙন গগন না হলেও মেঘলা আকাশের যেন তুলনা নেই। শৈশব এবং যৌবনের সমস্ত স্বপ্নই এই ভ্রমর-কৌটোর মধ্যে ধরা আছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগটা মানুষকে কাহিল করলেও বেশ কবিত্ব-ময় একটা মেজাজ দিয়ে যায়। গায়ে হাতে বেদনা নিয়েও মনটা বেশ হাল্কা লাগছিল। রুক্ষ চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালাতে চালাতে শোভন সন্তর্পণে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভাঁজতে চেষ্টা করল কিন্তু তার ঘরের দ্বিতীয় সরীক মহেশ্বরবাবুর অবিচলিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে উৎসাহটা নির্বাপিত হতে বিলম্ব হলনা।

প্রায় ব্রহ্মচর্য পালনের ভঙ্গীতে তিনি মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে টিউটোরিয়ালের খাতাগুলো দেখছিলেন। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, দীর্ঘ শিখা এবং নিকেলের চশমা তাঁর একাগ্রতাকে যেন দ্বিগুন বলীয়ান করেছে। কুইনাইনের ইম্প্রেসনের যদি কোন

অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি আঁকা সম্ভব হয় তবে তাঁর সাম্প্রতিক মুখভঙ্গিমার কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যেতে পারে। তিক্ত-বিরক্ত কথাদুটো প্রায়শই কাছাকাছি কেন থাকে শোভন এবার যেন অনুমান করতে পারল।

এ-ঘরের অবস্থা এমন গুরুতর হলেও পাশের ঘরে তাণ্ডব শুরু হয়েছে। সেখানে সবাই প্রায় সমান বয়সের সমান মেজাজের। সুতরাং যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে, অবস্থা। মাঝে মাঝে দমকা হাসিতে আর তর্কবিতর্কে, তবলায় রূপান্তরিত তক্তপোষের আর্তনাদে, কণ্ঠসঙ্গীতে পাশে ঘর গোটা মেসবাড়িটাকে দাবিয়ে রেখেছে। অন্যান্য ঘরগুলিতে কোথাও তাস, কোথাও বা ক্যারম চলেছে এবং বলাই বাহুল্য উভয় ক্রীড়াশৈলীই নিঃশব্দগামী নয়। চার দেয়ালের মধ্যে এই নিরঙ্কুশ অবকাশের মুহূর্তে, কেউ আর অধ্যাপক নয়, ছাত্র জীবনে সবাই যেন ফিরে গেছে। শহরের একপ্রান্তে তাই রক্ষা, নইলে এই উদ্দাম উল্লাস ছাত্র মহলে রটে গিয়ে যে অবস্থা হত তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়।

মহেশ্বরবাবুর নাকমুখের কুঞ্চন আসলে এই তাণ্ডবের নিঃশব্দ প্রতিবাদ। ওপাশের ঘরে যেন হরিসাধনবাবু আত্মরক্ষার একটি মারাত্মক বর্ম আবিষ্কার করেছেন। ইক্‌নমিক্সের প্রফেসর। পঁয়ষট্টি বছরের হরিসাধনবাবু তাঁর যোগাসনে বসে ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্ কষেন। সে সময় কার সাধ্য যে তাঁর ধ্যান ব্যূহ ভেদ করে।

অন্যান্য সহকর্মীরা শোভনকে ঘর বদল করতে অনুরোধ করেছে বহুবার। কিন্তু সে কর্ণপাত করেনি কারও কথায়। কারণ মনে মনে বরং এই নিরুত্তাপ গম্ভীর পরিবেশই সে কামনা করে। বয়স অল্প হলেও নির্জনতাই তার অবসরের কাম্য। নিজেকে একাকী করে স্বতন্ত্র করে সরিয়ে রাখতে হলে ওই আড্ডার থেকে এতটা দূরত্ব রক্ষারই প্রয়োজন ছিল। এবং মহেশ্বরবাবুর দৌলতে তা সে সহজেই পেয়েছে। সংস্কৃতের এই অধ্যাপকটিকে বয়স এবং স্বভাব উভয় কারণেই সকলে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।

সকলে ভয় এবং বিতৃষ্ণায় তফাৎ চললেও মহেশ্বরবাবুর সঙ্গে শোভনের কোন বিরোধ নেই। উল্টে একথা বলা যায় যে শোভনকে তিনি স্নেহের চক্ষেই দেখেন এবং এই ব্যাচেলর ভদ্রলোকের স্নেহের অংশীদার হওয়া প্রায় দুর্লভ সৌভাগ্য। মেসের ঠাকুর চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁর মারমুখো মেজাজের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিচিত।

মেঘ করলে আকাশ খুব কাছে চলে আসে। তারপর মেঘ যখন গুরগুর করে ডাকে তখন একেবারে বুকের মধ্যে। শোভনের বুকের মধ্যেটা খুব নির্জন, কেউ-নেই দুপুরের মত, রক্তোচ্ছল হৃদপিণ্ডটাও তখন বোধ করি বাদ পড়ে যায়। শুধু থাকে কয়েকটা মেঘলা প্রহর, মেঘের পরে মেঘ জমা ঠাণ্ডা আকাশ, একটা ধূসর অবসর, চেতনের আলো অচেতনের ছায়া মেশানো একটা ঘুঘুর ডাক। এই ঘুঘুটার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় নেই কোনদিন। শুধু সে ডাক পাঠায় কাঁপা কাঁপা রেখায়, কোন আড়াল থেকে। আর এই মেস বাড়িটাকে তখন নির্জন দ্বীপের মতই অবসন্ন মনে হয়। এত হৈ-চৈ গণ্ডগোল সত্ত্বেও। আশে পাশের মফঃস্বল অধিবাসীদের সঙ্গে, এখানকার স্থায়ী জীবনযাত্রার সঙ্গে এই অস্থায়ী প্রবাসীর দলের বেশ একটু দূরত্বের সম্পর্ক এমনিতেই। অধ্যাপকদের বিপদ এইখানেই, শ্রদ্ধা পায় কিন্তু অন্তরঙ্গতা পায় না। তাই এত চেঁচামেচি হৈ-হল্লা চলে। সুস্থ চোখে দেখলে একটু বাড়াবাড়িই মনে হয়। সুখের বিষয় কাছাকাছি বসতি নেই, বাড়িঘর নেই, তাই আব্রুটা রক্ষা পায়, এই স্মৃতিজীবীর দলের উদ্দামতায়ও ভাঁটা পড়ে না।

কিন্তু নিজের জীবনটার কথা ভাবতে চায় না শোভন। সে শুধু যন্ত্রণার ইতিহাস। তেপান্তর মাঠের মত আদি অন্তহীন অতীতটাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখাই ভালো। সেখানে হু হু হাওয়া, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে লাভ নেই, দুঃখই বাড়বে। বরং এই ভালো, নিজেকে ভয়ঙ্কর রকম নিঃসঙ্গ মনে হলেও এই ভালো। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা

নেই, পরিকল্পনা নেই, অনির্বাচিত জীবনটা দীর্ঘ মনে হলেও ঠাণ্ডা রেখাহীন জলের মতই নিঃস্রোতা। পড়াশোনা করা আর পড়ানো, সময় কাটানর জন্যে প্রাইভেট টুইশানি এবং চুপচাপ বসে থাকা। কিছু ভাবা এবং অধিকাংশই না ভাবা, প্রায় জেগে জেগে ঘুমোনো। এই ভালো। নিঃসঙ্গ মনে হলেও এই ভালো। কলেজ জীবনের একটি প্রিয় কবিতার লাইন মনে পড়ে বারবার। তখন ছিল কবিতা, এখন হয়েছে আর্যবাক্য, উপদেশ : কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! কেউ না, অন্তত শোভন তো নয়ই।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আকাশের মেঘমণ্ডল আপাতত অস্পষ্ট। অন্ধকার এগিয়ে এসেছে দ্রুতপায়ে। জানলার শিক ধরে ফেলেছে। ঘরের মধ্যেটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। মহেশ্বরবাবু উঠে গিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে নিলেন। অন্যান্য ঘরেও ভাঁটা পড়েছে কোলাহলের। অনেকেই হয়ত মুগ্ধ হয়ে গেছে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে। কান পেতে থাকার মত বৃষ্টি। রান্নাঘরের টিনের শেডে ঝমঝম ঝনঝন আওয়াজ। উথাল পাথাল হাওয়ায় জলের রেণু ভেসে আসছে। দূরে কোথায় বাজ পড়ল। সব মিলিয়ে একটা তন্দ্রা। জ্বর জ্বর ভাব ছিলই, এই ঠাণ্ডায় শীত করছে শোভনের। জানলা বন্ধ করে দিলে হয়। কিন্তু এমন দিনে জানলা বন্ধ করে দিলে আর কি থাকে।

ঠাকুর চা দিয়ে গেল টেবিলের ওপরে। টেবিলটা কাছে টেনে আনা দরকার। হাত বাড়ালেই যাতে পাওয়া যায়।

শোভনবাবু জানলা বন্ধ করে দেব? শীত করছে না তো—

মহেশ্বরবাবু কথা বললেন এতক্ষণে। চায়ে চুমুক দিয়ে তাঁর মৌনতা ভঙ্গ হল।

না থাক। ঘাড় না ফিরিয়েই শোভন ধীর গলায় কথা বলল, বেশ লাগছে।

শোভনবাবু, কেমন আছেন আজ ?

এবার নতুন গলা কিন্তু চিনতে কষ্ট হলনা। তাদের ডিপার্টমেন্টের সোমনাথ লাহিড়ী। গত বছর ঢুকেছে। শোভনকে যথেষ্ট সমীহ করে।

আসুন সোমনাথবাবু, কলেজ থেকে কখন ফিরলেন।

এই একটু আগে, জামাকাপড় ছেড়ে আসতে যা দেরি হয়েছে।

খুব ভিজেছেন বুঝি।

সোজা হয়ে বসে পাশে জায়গা করে দিয়ে ফের বলল, বসুন এখনে—কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার পাশে কি বসবেন, ভেবে দেখুন।

রসিকতাটা ধরতে পেরেছে এমনি ভঙ্গীতে হা হা করে হাসল সোমনাথ। তারপর চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে পাশে এসে বসল।

আপনার চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে—

হ্যাঁ, এইত—

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে কাপটা তুলে নিল শোভন।

তারপর কলেজের খবর কি বলুন।

প্রেসার একটু পড়েছে দাদা, তা হোক। আপনার ক্লাসগুলো নিতে আমার মন্দ লাগেনা, তবে বেশিদিন আর নিতে হবে না।

কেন, কি হল আবার ?

সোমনাথ একটু চঞ্চল, ছটফট করে কথা বলে। যাকে বলে লাইফ তা আছে ওর মধ্যে। বেশ ভালো লাগে শোভনের। একটু যদি শান্ত হয়ে পাড়াশোনা করত, বেশ হত। আড্ডায় অবশ্য সময় ওড়ায় না। বাঁধানো একটা নীল খাতায় চুপি চুপি কি যেন লেখে অবসর সময়ে বসে বসে। এক লাইন দু-লাইন লিখেই যেভাবে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাতে বুঝতে দেরি হয় না লেখার বিষয়টা কি। এ-বয়সে বাঙালীর ছেলের যা হয়। অর্থাৎ মিল খোঁজার ব্যবসায় নেমেছেন শ্রীমান। কিন্তু গুণ আছে, সে-লেখা কাউকে পড়ে শোনায় না। শোনায় না তাই বা কি করে বলা যায়,

পড়ে শোনায় না হয়ত কিন্তু লিখে যে শোনায় না তার প্রমাণ কি। বিশেষত যেভাবে সোমনাথ পোস্ট অফিসে ছুটোছুটি করে এবং যখন তখন খামের মুখ বন্ধ করে, তাতে উল্টোটাই স্বাভাবিক। খুব কাছের কেউ দূরে আছে হয়ত এই লাজুক ছেলেটির।

শোভন কৌতুকভরা চোখে সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আপনার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে খুব পছন্দ করছে না শোভনবাবু। আপনি সেরে উঠুন দাদা তাড়াতাড়ি।

আর তো হয়ে এল, সামারের ছুটি তো হয়ে এল বলে, কদিন আছে?

এই সপ্তাহটাই বোধহয় আছে, তা হলেও—আসল কথাটাই ভুলে গেছি বেমালুম। আপনার একখানা চিঠি এসেছে আজ। কলেজে পড়ে ছিল, নিয়ে এলুম।

খুব একটা সুখবর দিচ্ছে এমনিভাবে কথাটা বললে সোমনাথ। কিন্তু শ্রোতার চেহারায় কোন উৎসাহই ফুটল না। এমনকি খামখানা হাতে পেয়েও যখন চোখ না বুলিয়েই অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে বালিশের পাশে সরিয়ে রাখল শোভন, সোমনাথকে একটু আহতই মনে হল। কিছুক্ষণ কোন কথাই খুঁজে পেল না প্রসঙ্গ চাপা দেবার মত। শেষে বলল, বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলাম, খামটা ভিজে গেছে কিন্তু। আচ্ছা, তাহলে এখন আমি যাই।

একটানা বৃষ্টির শব্দে একটুক্ষণ কান পেতে থেকে মৃদু হাসল শোভন। সোমনাথ চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকল। বৃষ্টি ধরে এল একসময়। জানলার বাইরে প্রশান্ত আকাশে তারা ফুটল একটি একটি করে। রুক্ষ রাঢ়ভূমির আকাশে আবার একটি উজ্জ্বল রাত্রি। চাঁদ উঠেছে আশে পাশে কোথাও। খোয়াইয়ের ভিজে নুড়িগুলি জ্যোৎস্নায় চিকচিক করে জ্বলছে।

মেসবাড়ি সহসা চুপ করে গেছে। আলোর বৃত্তের নিচে আলোর কীটেরা জমেছে এখন। লেখাপড়ার কাজে মন বসিয়েছে কোলাহলকারীর দল। মহেশ্বরবাবু কখন ঘর থেকে উঠে গেছেন। দেয়ালে একটা টিকটিকি নিজের ছায়ার দিকে স্তম্ভিত চোখে চেয়ে আছে। লণ্ঠনের আলোয় হরেকরকমের ছায়া জমেছে দেয়ালে। শোভনও সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। টেবিলল্যাম্পটি জ্বালবে কিনা ভাবছে মনে মনে। চোখের কাছে আলো সহ্য হবে না। অন্ধকারই বেশ ভালো অসুস্থ শরীরে। অন্ধকার কাজলা দীঘির মত চোখের দাহ জুড়িয়ে দেয়। সব তাপ সব জ্বালা। শোভন ভাবল, তবে আমরা অন্ধকারকে ভয় দিয়ে ঘিরে রাখি কেন। অজানাকেই কি আমাদের সত্যকারের ভয়। জানাকে কি আমরা ভয় করে চলি না কখনও।

চিঠির কথাটা মনে পড়ল। কলেজের ঠিকানায় তাকে আবার কে চিঠি দিল। কোন পুরনো বন্ধু হয়ত দীর্ঘ সময়ের বিচ্ছিন্নতার সমুদ্র লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেতুবন্ধন কি আর সম্ভব হবে। সে সব দিন আর ফিরে আসবে না, আসে না। সবাই এখন ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে, গৃহস্থ হয়ে স্বভাবচরিত্র বদলে ফেলেছে। পেশা তাদের নেশা ছুটিয়ে দিয়েছে। কখনও কদাচিৎ চিঠির পাতায় পাতায় সেই মরা দিনগুলোর মর্মর ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সবাই হা-হুতাশ করে, আত্মবিলাপ জানিয়ে শেষে একছত্র লেখে : তুই বেশ আছিস। দায়দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ে আমরা সবাই যেতে বসেছি। কেউ লেখে, সেই সব দিনগুলোই সত্যিকারের দিন ছিল রে। কিন্তু সূর্য গেল অস্তাচলে···

শোভন হাসল নিজের মনে। বালিশের পাশ থেকে খামখানা তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল। কমজোরি আলোয় ঠিকানাটা বোঝা গেল না। জল লেগে কালি ঝেপ্‌সে গেছে। তবু এ তারই চিঠি, সোমনাথ দেখেই এনেছে।

ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে মহেশ্বরবাবুর লণ্ঠনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সর্বাঙ্গে একটা অনতিস্পষ্ট বেদনা। সারাদিন শুয়ে থেকে মাথার ভেতর কি রকম শূন্য বোধ হচ্ছে। খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা বার করল। ছোট্ট একটা চিঠি, মেয়েলী হাতের, সুশ্রী ছাঁদের হরফগুলো দেখেই চমকে গেল। খুব চেনা মনে হল। মনে হল, এ হাতের লেখা তার অজ্ঞাত নয় কিন্তু মনে করতে পারল না চট করে। প্রথম পৃষ্ঠায় শেষ হয়নি, লেখাটা গড়িয়ে গেছে উল্টো পিঠে। নামটা সেখানেই আছে। কিন্তু শোভন সে-চেষ্টা না করে প্রায় উচ্চারণ করেই পড়তে লাগল চিঠিটা ঃ

নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছো, বিরক্তও। সাত বছর পরে, ভাবছ, তোমার সঙ্গে এই স্বার্থপর মেয়েটা গায়ে পড়ে আবার আত্মীয়তা জমাতে চেষ্টা করছে। ভাবছ, এতকাল যে চুপ করে ছিল, তার চিরকালের মতই চুপ করে থাকা উচিত ছিল। কী জানি, হয়ত তাই উচিত ছিল, কিন্তু জানো তো, আমাদের জীবনে যা-কিছু ঘটে, ঘটতে থাকে তার সবটাই উচিতের পথ ধরে চলে না।

যাক সে কথা। বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতার বাসার ঠিকানায় তোমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলুম। আজ জেনে লাভ নেই তবু জিজ্ঞেস করি, সে চিঠি কি তুমি পাওনি ? আজকের চিঠিও তুমি পাবে কিনা জানি না, কারণ না-পাওয়াটা কিছুটা তোমার নিজের হাতে কিছুটা ডাকঘরের ; কিছুটা ঠিকানার সত্যাসত্যের ওপরেও নির্ভর করে। এতকাল পরে, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, যদি চিঠিটা সত্যিই পাও, তাহলে এই চিঠির সঙ্গেই ছোট একটা নিমন্ত্রণ থাকলো, সম্ভব হলে রক্ষা করো। গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকদিনের জন্যে যদি আমাদের এখানে চলে আসো তবে সত্যিই ধন্য হই, ব্যাকরণ ভুল ধরো না। বিয়ের সময় তো এলে না, সাতবছর পরে অন্তত তার ক্ষতিপুরণ করে যাও। জোড়াপল্টনকে নিশ্চয়ই ভোলনি এরই মধ্যে, সেখানেই আছি। সাতবছর পরে এই আমার প্রথম চিঠি

এবং হয়ত শেষ চিঠি, মনে রেখো কথাটা। ভালোবাসা নিও। বিনীতা।

চিঠি পড়া শেষ হলে বিবর্ণ মুখে আবার নিজের বিছানায় ফিরে এল শোভন। এই ছোট্ট একটা খামের মধ্যে আজ এতবড় একটা বিস্ময় লুকিয়ে এসেছিল মুহূর্ত আগেও তা ভাবনার অতীত ছিল তার কাছে। জীবনের একটা বিগত অধ্যায়, কতকগুলো মরা পাতা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। যাকে ভুলব না বলে মানুষ স্পর্ধা করে তাকে কখন একসময় অনায়াসে ভুলে যায় কিন্তু যাকে দিবারাত্র ভুলবার চেষ্টা করা যায়, তাকে ভোলা যায় না। সাত-বছরে তাই, ভেবে দেখল শোভন, কিছুই ভোলা হয়নি, কিছুই মোছেনি স্মৃতির পট থেকে।

জোড়াপল্টনকে ভোলেনি শোভন, বিনীতাকেও না। তার প্রথম জীবনের, যৌবনের ইতিহাসে তাদের কথা অনেকখানি জুড়েই রয়েছে, সারাজীবনের ইতিহাসেও তারা প্রথম সারিতেই স্থান পাবে। স্মৃতিকে নিয়েই বিস্মৃতির সঞ্চয়, কিন্তু বিস্মৃতির কোন অংশই স্মৃতির প্রাপ্য নয়। ভালোবাসা নিও, কথাটা ঠাট্টার মত বিঁধেছিল প্রথম পাঠে। মেয়েদের সত্যিই চেনা যায় না, কাছে যখন থাকো, দিনপ্রতিদিনের থেকে যখন তাদের জন্য তুমি সময় দিতে পারো, তখন তাদের একরকম চেহারা, আবার দূরে রেখে ছাখ সম্পূর্ণ অন্য চেহারা, কখন বদলে গেছে ভাবতেই পারবে না, কতখানি বদলে গেছে তাও। ভালোবাসা নিও, সাতবছর পরে এটা ব্যঙ্গ ছাড়া আর কি।

যে বিনীতা অনায়াসে চলে যেতে পারল, অপেক্ষা করার চেয়ে যার পক্ষে চলে যাওয়াটাই সহজতর পথ বলে মনে হল, তাকে শোভন ভুল চিনেছিল ছাড়া কি বলবে। ভূতভবিষ্যৎহীন একটি ছাত্রের হাত ধরে বসে থাকার চেয়ে বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়েছিল পাথর ব্যবসায়ী এক মধ্যবয়সী লক্ষপতিকে বরণ করে। ঘটনাটা অবশ্য আকস্মিকভাবে ঘটেনি, সূচনাপর্ব চলেছিল অনেকদিন আগে

থেকেই। তবে শোভন সবটা জানত না। বিনীতার অভিভাবকরা এবিষয়ে যে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন এবং উভয় পরিবারে যে রীতিমত মেশামেশি চলেছে তা শোভনের জানবারও কথা নয়। তখন সে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দিদিমার অসুখের সংবাদ পেয়ে বেনারসে গিয়েই চমকে গেল বিনীতার মুখে সব শুনে। সেদিন বিনীতার আবেদনও খুব সামান্য ছিল না, অর্থ-সামর্থ্যহীন শোভনের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সময় চেয়েছিল, ভেবে দেখতে চেয়েছিল, মনস্থির করতে চেয়েছিল, কারণ প্রতিকূলতা প্রায় চতুর্দিকেই ছিল। উত্তেজনার মুহূর্তে লাফ দেওয়ার চেয়ে ভেবেচিন্তে একপা দুপা করে এগোবার পক্ষপাতী শোভন। সময়ের পরিমাণ জানতে চেয়েছিল বিনীতা আহত কণ্ঠে। কিন্তু সময়ের কি পরিমাণ হয়, পরিমাপ হয়? একবছর হতে পারে, দুবছর হতে পারে, তিন চার পাঁচ বছরেও আবার না হতে পারে। সঙ্কুচিত ভঙ্গীতে জানিয়েছিল শোভন।

বিনীতা বেশি কথা বলেনি। বলবার মত অবস্থাও ছিল না তার, শুধু বলেছিল, অসম্ভব। তারপরে আরও কি সব কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে, সব ভাববার মত অবস্থা নয় শোভনের এখন। কলকাতা ফিরে আসবার পর যখন রিসার্চ ব্যাপার নিয়ে সে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন পেয়েছিল একখানা চিঠি, হলদে কাগজে ছাপানো, যাকে বলে সরকারী নিমন্ত্রণ। হলদে কাগজে ছাপানো সেই কয়েকছত্র ভদ্রতা শোভনের কাছে প্রায় বজ্রপাতের মতই মনে হয়েছিল। কিন্তু বজ্রেও বাঁশি বাজে, একটা মুক্তির আনন্দও কোথা থেকে বুকের মধ্যে এসে জুটছিল মাঝে মাঝে। নিদারুণ অভিমানের মধ্য দিয়ে মনে হয়েছিল এই ভালো হল। সেদিন বিনীতার সমস্ত উপস্থিতি তার স্মৃতিতে তার চৈতন্যে ততখানি করে বাজে নি, বছরের পর বছর পার হয়ে যা উপলব্ধি করেছে।

সেদিনকার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয়ে ওঠেনি, বলাই বাহুল্য। অন্য

কেউ হলে আত্মহত্যা করাও বিচিত্র ছিল না। শোভন সে সবের ধারে কাছে না গিয়ে সেরাত্রে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এমন একটি কাজ করেছিল যা ভাবতে আজ লজ্জাও করে হাসিও পায়। সে কবিতা লিখেছিল। বিনীতাকে অন্য চেহারায় সাজাতে চেয়েছিল। আজও এই নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে, যদিও সেদিনের সঙ্গে আজ অনেক তফাত, সেই কবিতাটির কথাই মনে পড়ল। শুধু মনেই পড়ল না, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করল। সেটা যেন বিনীতার ফটোগ্রাফের মত, তার সেই শেষ কবিতা, যার পরে আর সে কখনো কলম ধরেনি।

বিছানা থেকে উঠে পড়ল শোভন। ড্রয়ার থেকে চাবির গোছা নিয়ে তোরঙ্গ খুলতে বসে গেল। কবিতাটা তার এক্ষুনি চোখের সামনে চাই। অনেক খুঁজে খুঁজে, জিনিসপত্র হাঁটকে হাঁটকে একখানা পুরনো ডায়েরি বার করল। তারপর ডায়েরির সেই বিশেষ একটি দিনের একটি পাতা। লাল কালি দিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা সেই ষোল লাইনের কবিতাটি নিজের লেখা বলে কিছুতেই আর বিশ্বাস হয় না। এই ছেলেমানুষী ভাবতে আজ হাসি পায় কিন্তু সেদিন রক্তের অক্ষরেই লেখা হয়েছিল। বিনীতা এরকম ভাবেই নি কোন দিন, বেনারসী আর লালচেলির মধ্যে বসে হীরে-মুক্তায় অলঙ্কৃত হতে হতে এত কাঁচা ভাবনা তার আসতে পারে না।

আমার চোখের পাতা পদ্মপাতা, কয় ফোঁটা জল নিয়ে খেলা,
সারাবেলা সারারাত ধরে শুধু, জলরেখা কাঁপছে হৃদয়ে
একটু উঁচুতে পদ্ম, সরোবরে যাচ্ছে, যাবে বেলা
আমার চোখের পাতা কখনো ভেজে না, ভয়ে ভয়ে
এখন তোমাকে ভাবছি, গ্রন্থকীট হে বীরপুরুষ,
কোন দুঃখ বুকে নিয়ে ঘুরছো আজ, এখন কি নিঃসঙ্গ একাকী?
সবাই এসেছে এই উৎসবে আলোয় আড়ম্বরে
একমাত্র তুমি ছাড়া, উজ্জ্বল নকল ঝাড় বাতি
নক্ষত্র-বৃষ্টির মত চোখ ঝলসে জ্বলছে ঘরে ঘরে

সানাই ধরেছে শূন্যতান যেন বিসর্জনের আরতি
প্রদীপের শিখা পুড়ছে বুক জুড়ে আসন্ন বধূর,
আসবে না জানতাম তবু প্রত্যাশায় প্রত্যাশায়
সমস্ত বিকেল ধরে ক্ষয় হচ্ছি, সাজসজ্জা, প্রসাধন, সখী
আমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে, বহুদূর
স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের অতিথি কোন্ দুঃখ নিয়ে ঘোরে ?
আমার চোখের পাতা পদ্মপাতা, কয়ফোঁটা জল নিয়ে খেলা ॥

খেতে যাবেন না শোভনবাবু ?

মহেশ্বরবাবু গেরুয়া লুঙ্গি পরে স্নানান্তে পৈতেটিকে দু-হাতে মাজতে মাজতে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

ডায়েরিটাকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে শোভন বলল, আপনার স্নান হল ?

হ্যাঁ।

আপনি যান, আমি আজ কিছু খাবনা ভাবছি।

টেবিলের ওপর থেকে নিকেলের চশমাটা তুলে চোখে পরতে পরতে মহেশ্বরবাবু বললেন, তা উপবাস অবশ্য উত্তম, শরীর ঝরঝরে হয়ে যায়।

সকাল বেলায় যখন ঘুম ভাঙলো শোভনের তখন বেশ বেলা হয়েছে। গতরাত্রের বৃষ্টি ভেজা খোয়াই উজ্জ্বল রোদে ভাসছে যেন। শালবনের নীলাঞ্জনরেখা আরো স্পষ্ট হয়েছে। জানলা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেল। অনেকদিন এমন অকারণ ভালো লাগা ছিল না, এমন চপল আনন্দ আজ কোথা থেকে এসে জুটল, কেন এসে জুটল ভেবে পেল না।

শরীরটা ঝরঝরে লাগছিল বেশ। উঠে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে দেখে ঠাকুর চা দিয়ে গেছে। প্লেট দিয়ে কাপটা ঢেকে রেখে নিজের

পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে সোমনাথ। মহেশ্বরবাবু এই সকালে থাকেন না, তাই এক একদিন সোমনাথ এসে গল্পগুজব করে।

আসুন দাদা, শরীর আজ অনেকটা ভালো তো ?

শোভন মৃদু হেসে বলল, তা ভালো, কিন্তু আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলাটা কি ভালো।

সোমনাথ প্রায় বিবর্ণ মুখে তাকিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমি কি লুকোচুরি খেললাম শোভনবাবু ?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য সরিয়ে এবার শোভন আত্মপ্রকাশ করল। আরে না না, সিরিয়াস কিছু ভাববেন না, তবে কিনা নিতান্তই অরসিক আমি নই, রস-নিবেদন মাঝে মধ্যে একটু করলে খুব কিছু খারাপ কাজ করা হবে না, তা বলতে পারি।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল সোমনাথ। শোভন এভাবে কথা বলেনি কোন দিন, এত হাল্কা হয়ে কথা বলতে এই প্রথম শুনল সোমনাথ।

আপনি কবিতা লেখেন সোমনাথবাবু ? আহা, লজ্জার কোন কারণ নেই, কবিতা লেখাটা গুণেরই কথা। তা আমাকে শোনাবেন আপনার কবিতা। একেলা গায়কের নহে তো গান, বুঝলেন না, শ্রোতার আবশ্যক আছে।

আরক্ত মুখে সোমনাথ বলল, কে বলেছে আমি লিখি ?

ওকি আর বলে দিতে হয়, যান, শুভস্য শীঘ্রম্। আপনার সেই নীল মলাটের খাতাখানা নিয়ে আসুন।

কিছুতেই স্বীকার করানো গেল না সোমনাথ কবিতা লেখে। অল্প কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ বিদায় নিলে শোভনের হঠাৎ গত রাত্রের চিঠির কথাটা ধ্বক করে মনে পড়ে গেল। কাল রাত্রে নানা ভাবনায় পীড়িত হয়েছিল, আজ দিনের আলোয় কর্তব্যের কথা। যাবে কি যাবে না এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে।

না ভুল হয়নি।

বাইরের দেওয়ালের নীললাল রঙে আঁকা পল্টনের ছবি ছুটো ফিকে হয়ে এলেও এখনো আছে, এখনো তাদের এক নজরেই চেনা যায়। তারপর মন্দিরের দরজার মত কারুকাজ করা শৌখিন নক্সা কাটা, খাটো, মোটা, কালো রঙের দরজাটাও না-চেনবার মত নয়।

অবশ্য এ-ধরণের দরজা, এই মিনিয়েচার ধরণের, বেনারসের একচেটিয়া স্টাইল। প্রায় বাড়িতেই এই ধরণের কপাট ব্যবহার করা হয়। কেন করা হয় কে জানে, হয়ত একটা মন্দির মন্দির ভাব মনে আসে বলেই।

নিজের অনুমানটাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে শোভন ডানদিকের তৃতীয় বাড়িটার উদ্দেশে তাকাল। না, ঠিক আছে, সেই ধ্বসনামা, চূড়াভাঙা, পড়োপড়ো বাড়িটা তার শরীরের অধিকাংশ ইঁট আর পাথরের নমুনা বের করে এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্য ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কথাটা ঠিক নয়। চুলচুল করে মাটির তলায় বসে যাচ্ছে, একদিনে একনজরে সেটা বোঝা যায় না। সত্যি, শোভনের মনে হল, এই সব প্রায় প্রাগৈতিহাসিক বাড়িগুলোর উদ্ধার আর কোনদিনই সম্ভব নয়, কোন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টই এর সদ্‌গতি সাধন করতে পারবে এমন বিশ্বাস হয় না। কর্ণের রথের মত নিয়তি এদের টান চড়িয়েছে মাটির তলা থেকে।

রোম একদিনে তৈরি হয়নি, বেনারসও না। শতাব্দীর পর শতাব্দীর পলেস্তারা লেগে লেগে এর দেবনাগরী হরফ গড়ে উঠেছে, এই উঁচুনিচু অসমতল, অসমান্তরাল ঠাসবুনুনি প্যাটার্ন। কোথাও

এক ইঞ্চি ফাঁক নেই, স্থানবিশেষে সূচ্যগ্র মেদিনীও খুঁজে পাওয়া যায় না, পাথরে পাথরে একেবারে যেন সিল করা। ভেঙে যেতে পারে, একদিন ভাঙবেই, মাটির তলায় কিছুটা বসে যাবে, মাটির ওপরে কিছুটা পড়বে ধ্বসে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর গড়া হবে না। কথাটা ভাবতেও আজ অদ্ভুত লাগল, বেনারসকে সে এ-চোখে দেখেনি কোনদিন।

হোল্ডঅলটা নামিয়ে রেখেছিল আগেই। এবার হাতের স্যুটকেশটা তার ওপরে রেখে আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল। শোভনের মনে হল কড়া নাড়ার মৃদুশব্দ এই দাম্ভিক বাড়িটার পেটের ভিতরে পৌঁছল না। সবটাই যেন তার দিকে ফিরে এল, তার বুকের মধ্যে, তিনটে লঘুস্পন্দ টোকার মত।

বুকের মধ্যেটা কেন জানি একটু চঞ্চল হল, এবং হঠাৎ এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হল যে সে প্রচণ্ড ঘেমে গেছে। ঘামাটা আশ্চর্যের কিছুই নয়, বাইরে রোদ্দুরের যা তাপ, গলির ছায়ায় দাঁড়িয়েও মনে হয় মুখ চোখ শুকিয়ে বসে যাচ্ছে। আর, কম পথটা তো তাকে হেঁটে আসতে হয়নি, সেই গোধূলিয়ার মোড়ে বাস থেকে নেমে এই বাঙালীটোলা পর্যন্ত।

অন্যকাল কিম্বা অন্য সময় হলে অবশ্য কিছুই মনে হত না। অতটা সুখের শরীর তার নয়, কিন্তু একে গ্রীষ্মকাল এবং চড়ন্ত বেলা, তার ওপরে একহাতে একটা ভরা স্যুটকেশ অন্য হাতে ছোট একটা হোল্ডঅল, এবং সেই সঙ্গে রাত জাগার ক্লান্তি। অবশ্য শরীরটাকে এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত মনেই হয়নি, একটি নাটকীয় ব্যগ্রতা তাকে ভেতর থেকে স্টীমের মত ক্রমাগত সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে।

জামাটা পিঠ বুক আর গলার কাছটায় ভিজে উঠেছে। ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম জমেছে সারা মুখে। ভুরুর ওপর শিশিরবিন্দুর মত

টলমল করছে দুটো ফোঁটা, চশমার কাচ দুটো ঝাপসা ঝাপসা ঠেকছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমাটা মুছলো ভাল করে। তারপর ভুরুর কাছটায়, তিন আঙুলের সাহায্যে আবার চশমাটাকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু সত্যিই কোন সাড়া আসছে না ভেতর থেকে। জ্বলন্ত করুগেটের টিনের মত আঁকাবাঁকা ধারালো রোদ্দুর নেমে এসেছে আধখানা গলিতে। চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটটা বোধহয় কয়েকটা বাড়ি ছাড়ালেই। যতদূর মনে পড়ছে, এই গলিটাই বিট্‌ঠল মন্দিরের কাছে, হঠাৎ একটা বাঁক নিয়ে খাড়া ঝুঁকে পড়েছে গঙ্গার বুকের ওপরে।

কিন্তু বিনীতা কি করছে এই সময়, এবং বিনীতার স্বামী। ভদ্রলোক নিশ্চয় এখন কর্মস্থানে পাথরের মর্ম বোঝার কাজে ব্যস্ত। চাকররাই বা কি করে এই সময়, কেউ কি এসে দরজা খুলে দিতে পারে না? শোভন এবার অধৈর্য হাতে বেশ জোরে জোরে কড়া নাড়ল।

কড়া নাড়বার আর প্রয়োজন ছিল না হয়ত, কারণ দরজাটা খুলে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কপাট দু-খানা অল্প ফাঁক করে একটি কালো তোবড়ানো মুখ উঁকি দিল, এঁজ্ঞে কাঁকে অন্বেষণ করতিছেন?

এ বাড়ির চাকর হবে নিশ্চয়। সাধুভাষার বহর দেখে এবং উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে হাসি পেল শোভনের।

দিদিমণিকে খবর দাও, মেদিনীপুর থেকে শোভনবাবু এসেছে।

শোভনের কথার সঙ্গে সঙ্গে কপাট দু-খানা আর একটু ফাঁক হল, সেই সঙ্গে হাড়উঁচু মুখখানাও। শোভন স্পষ্ট বুঝতে পারল কথাটা বুঝতে ওর কোথাও গোলমাল হচ্ছে। তাকে তো চিনতেই পারেনি। এই নতুন চাকরের চিনতে পারবার কথাও নয়। তার কথাটাও কেন যেন বুঝতে পারে নি। অথচ এই সহজ কথাটা বুঝতে না পারার

হেতু খুঁজে পেল না শোভন। কি কথা বললে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় ভাবছে, এমন সময় চাকরটির বাক্‌স্ফূর্তি হল : এঁজ্ঞে কাঁকে খপর দিত্তি বলতিছেন, দিদিমণি··· ?

বিনীতা দিদিমণিকে চেননা নাকি। শোভন এবার রুক্ষ গলায় বলল।

জিভ কেটে লোকটি স্বপ্রতিভ ভাবেই বলল, নিশ্চয় আপনি মা জননীর কথা বলতিছেন। তা আগে বলতি হয়···আচ্চা, আপনি একটু দাঁড়া থাকেন বাবু, আমি এই যাই কি আসি···

দরজাটা আবার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। লোকটি যে খুব সাবধানী তা বুঝতে বিলম্ব হল না শোভনের।

একলা দাঁড়িয়ে মনে মনে লজ্জিত হল শোভন নিজের কাছেই। সাত সাতটি বছর যে চলে গেছে, মাঝে মাঝে ভুলেই যায়। দিদিমণি কবে মা-জননী হয়েছেন, সংসার বদল হয়েছে, বাড়িটা এক থাকলেও। অনেক পুরনো স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে পুরনো মুখগুলোও হয়ত সরে গেছে একে একে। পুরনো অভ্যাস, পুরনো রীতিনীতি কর্তার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। বিনীতার বাবা ভূষণবাবুর মৃত্যুসংবাদ কাগজে বেরিয়েছিল বহুকাল পূর্বেই।

চিন্তায় বাধা পড়ল। দরজা খুলে একগাল হেসে লোকটি আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

এঁজ্ঞে, ভিতরে আসতে আঁজ্ঞা হোক বাবু, জননী বলি দিয়েছেন।

শোভন হাত বাড়াবার আগেই লোকটি চটকরে সুটকেশ আর হোল্ড-অলটি তুলে নিল এগিয়ে এসে, পরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আসুন বাবু।

তোমার নাম কি? বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শোভন জিজ্ঞাসা করল।

এঁজ্ঞে, চিনিবাস। বিনয়ে মিহিকরে বলল নিজের নামটা।

ভেতরের উঠোনে পা দিয়েই শোভনের মনের মধ্যে কেমন শির-

শিয় করে উঠল। এই উঠোন কত চেনা ছিল একদিন। ছায়াছন্ন শ্যাওলা ধরা কলতলার ওপাশেই সেই ধার ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের সিঁড়িটা লাফাতে লাফাতে আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে।

একতলার ভাড়াটে কোন কিশোরের চোখে একদিন এটাকেই স্বর্গের সিঁড়ি বলে মনে হত। ওপরে রয়েছে আলোর রাজ্য, রোদে ঝকমকে ছাদ। আকাশ, হাওয়া, আর কি রকম একটা খুশির উত্তেজনা। আঠার বছরের নীল আকাশ, সে যে ভীষণ তীক্ষ্ণ। আবছা আবছা মেঘের রাজ্য ফুঁড়ে সেদিন উঠে গিয়েছিল এই লালচে পাথরের ধার ক্ষয়ে যাওয়া স্বর্গের সিঁড়ি।

এর প্রতিটি ধাপ তখন তার মুখস্থ ছিল, চোখ বেঁধে দিলেও প্রতিটি তরঙ্গে পা ফেলে যেত নির্ভুলভাবে। কতবার যে ওঠানামা করেছে একদিন।

একটা উদ্গত নিশ্বাস চেপে শ্রীনিবাসের পিছন পিছন সিঁড়ির পথ ধরল শোভন।

তিনতলার একটি ঘরের দরজা খুলে দিয়ে শ্রীনিবাস হাসিমুখে বলল, ভিৎরে আসেন বাবু।

ঘরটি শোভনের বিশেষ পরিচিত। দিদিমা মারা যাবার পরও প্রায় দিনকতক সে বেনারসে কাটিয়ে গিয়েছিল এই ঘরে। নিচের তলা থেকে তিনতলার আলোর রাজ্যে উঠে সেদিন মনে কোন আনন্দই হয়নি। ঘরখানাকে আজও মনে হল পাথরের মতই স্তব্ধ। সেতারে কেউ আলাপ সাধে না। ইজেল ফাঁকা, প্যালেটগুলোয় রঙের বদলে ধুলো জমেছে। খাঁচার দরজা খোলা থাকলেই যেমন খাঁচাকে সবচেয়ে বিষণ্ণ মনে হয় আমাদের কাছে, পাখির মুক্তির আনন্দ তার বাঁকাবাঁকা লোহার শিকগুলোকে স্পর্শও করে না।

হোল্ড-অল্ আর স্যুটকেশটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে পাখাটা খুলে দিয়ে চলে গেল শ্রীনিবাস। জানলাগুলো বন্ধ থাকায়

ঘরটা আবছা আবছা অন্ধকার। একটি ইজিচেয়ারে বসে শোভন সেগুয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ।

প্রকাণ্ড সাদা ভোমরার মত শব্দ করে পাখাটা কেবলই ঘুরে চলেছে। আর কোন শব্দ নেই। বুক পকেট থেকে শোভন একটি ঘামে ভেজা খাম্ বের করল। তার ভেতর থেকে একটি নীলচে রঙের কাগজ, ছোট ছোট লাইনে একটি নাতি দীর্ঘ চিঠি। কাঁপা কাঁপা গোল ঢেউ তোলা অক্ষরে ঘোর কালিতে লেখা, কিন্তু ভাষার মধ্যে কোন কম্পন নেই, নেই উচ্ছ্বাসের ইসারা। বরং একটা নিশ্চিত ভাব, একটা নিটোল সুখের মৌন অহংকার যেন ওই ক-টি ছত্রের প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। খামের নীল কাগজের চিঠিটা যেন অতটা বেশি নির্লিপ্তিতে অভ্যস্ত নয়। পত্র প্রাপক এবং লেখিকার মধ্যে অন্তত এতটা ভদ্রতার সম্পর্ক ছিলনা একদিন।

তাই একটা খোঁচা লেগেছিল শোভনের মনে। বিনীতা তাকে অপমান করতে চায় বুঝি, নিজের সুখ দেখিয়ে সমৃদ্ধি দেখিয়ে। বুঝিয়ে দিতে চায় কত অযোগ্য ছিল সে তার কাছে, এবং তার স্পর্ধা কতখানি ছিল যে, একদিন তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য, পেতে চেয়েছিল একান্ত করে।

আজ বিনীতা যে সৌভাগ্যের অধিকারিণী তার শতাংশও মফঃস্বল কলেজের বাংলার অধ্যাপকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিলনা। এটা তো নতুন করে উপলব্ধি করার কিছু নয়, এত আগাগোড়াই জানা কথা। শোভন মর্মে মর্মে অনুভব করেছে বলেই মনের কথা মনেই রেখেছিল শেষ পর্যন্ত। বলতে গেলে জোর করেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল, নিজের নির্জনতম ইচ্ছার থেকে দূরে। বিনীতাকে কী ভীষণ ভালবাসে, বিনীতাকে না পেলে তার বাঁচার আর কোন মানে হয়না এমন কথা জানাতে ভাষায় বেধে ছিল। তাই যখন বিনীতা অন্য পরিণাম বেছে নিল তখন দীর্ঘশ্বাসের রূপ ধরে একটা অজ্ঞাতপূর্ব মুক্তির স্বাদই যেন অনুভব করেছিল সে স্নায়ুর চৈতন্যে।

ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের যে নক্‌শা প্রায় তৈরি হয়ে আছে, সেটাকে ভেঙেচুরে তাকে নিয়ে দূরে পালালেই যে বিনীতাকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে শোভনের, সেদিনকার কাপুরুষ শোভনের সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। গ্লানির সঙ্গেই অনুভব করেছে সেকথা। পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর এঁকে মনে তার নিত্য আসা যাওয়াকেও বাধিত করেছে শোভন, এই দীর্ঘ সাতবছর সেই কৃচ্ছ্র-সাধনেরই ইতিহাস। সুতরাং এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে এতকাল পরে আজ পৃথক করে ডেকে আনবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

তবে ভালই হয়েছে, আজ জবাব দেবার দিন এসেছে। সেই দিনের সেই কাপুরুষটা, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যার মহা ভাবনা ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে। এখন যে শোভন বর্তমান, ক্লাসে বাংলা পড়ালেও যে কোন লোককে যে কোন সময় চমকে দেবার মত কথা বলতে পারে সে। আগের মত একটি কথা বলতে গিয়ে আড়াইবার ঢোঁক গিলতে হয় না এখন। বিনীতার সুখ, বিনীতার সমৃদ্ধি, তার মনে কোন রেখাপাত করেনি। আসলে তাকে সে ভুলেই গিয়েছিল। এই কথাটা আজ সুকৌশলে মুখের ওপর জানিয়ে দেবে শোভন।

আর, শোভন তা অনায়াসেই পারে। চুনারের কোন অজ্ঞাত-নামা স্টোন ডিলারের স্ত্রীকে সে মনে মনে করুণাই করতে পারে আজ। সোনা-রূপোর কাঠিতে আজকের দিনের রাজকন্যারা পরম সুখে ঘুমিয়ে থাকেন না, তাঁদের মানসিক মৃত্যুই ঘটে। জাগবার মুহূর্ত জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসে না। এ যুগে কেন, সব যুগেই। অর্থ বড় কথা হতে পারে কিন্তু তার চেয়েও যে বড় কথা আছে, একথা সে-ই জানে যে মনে মনে দরিদ্র হয়ে পড়েনি!

কিন্তু এও তোমার কাপুরুষতা শোভন। বিনীতার সুখে তুমি ঈর্ষিত হয়েছ, আহত হয়েছ। তা না হলে এমন করে ভাবছ কেন? তোমার ভাবনাগুলো ঠিক পুরুষের মত হচ্ছে না। বিনীতা

তোমাকে আঘাত দিতে চায়, সেজন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, একথা ভাববার মানে? ওই নিস্তরঙ্গ ছোট্ট চিঠিটার পিছনে অন্য কিছুও তো থাকতে পারে? নিছক একটু চোখের দেখা, এমনও তো হতে পারে, বন্ধু প্রিয়জনকে কি আমাদের দেখতে সাধ হয়না কখনও। বিনীতা কি তোমাকে একদিন ভালোবাসতো না?

হয়ত বাসতো। ভালোবাসা কাকে বলে, কাকে সত্যিকরে ভালোবাসা বলা যায় আমি তা জানি না। না জেনেও বলছি, বিনীতা হয়ত আমাকে ভালোই বাসতো। কিন্তু এখন আমি সে জন্যে কি করতে পারি, তখনই বা কি করতে পেরেছিলুম। তবে যা ঘটে গেছে তার জন্যে কি আমি একলাই দায়ী! মানলুম সন্দেহটা আমার নিজের সঙ্কীর্ণ ঈর্ষাকাতর মনের সৃষ্টি এবং নিতান্তই অমূলক। কিন্তু একেবারেই কি অমূলক? কারণ কি কিছুই নেই?

শোভন ভাবল, মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি এবং কত সহজে মরে যায়। মেয়েরা সুখে মরে, ছেলেরা অসুখে, দিনের পর দিন যুঝতে যুঝতে। একটা মৃত্যু হচ্ছে আত্মসমর্পণ, অন্যটা আত্মহত্যা। একটি গলে যাওয়া অন্যটি জ্বলে যাওয়া।

খুব যা হোক কথা শিখেছ শোভন, বাংলা ফিল্মের নায়ক তোমার কাছে কোথায় লাগে! বাংলার মাস্টারের বাগেন্দ্রিয়ই একমাত্র অস্ত্র। ছাত্র বয়সে মুখস্থ, ছাত্রান্ত বয়সে সেই মুখ অস্ত্র। ভালো ভালো। কিন্তু এত কথা তোমার সেদিন কোথায় ছিল, যেদিন একটা স্পষ্ট কথার অনেক দাম ছিল ভবিষ্যতের কাছে, একটি মেয়ের কাছে।

কিন্তু অতই যদি তোমার বিতৃষ্ণা তবে কাঁপা কাঁপা ঢেউ তোলা অক্ষরের এই চিঠিটাকে তুমি অস্বীকার করতে পারনি কেন। কতবার পকেট থেকে বের করে পড়েছ বল তো কলেজের মেসে বসে, ট্রেনের রাত জাগা জানলায় বসে!

আবছা ঘরে বসে বসে নিজের ছায়ার সঙ্গে যেন প্রলাপ বকছিল শোভন। এবার সমস্ত বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল। তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত কি ভেবে সেটা আবার পকেটেই রেখে দিয়ে হাতের খোলা চিঠির এক জায়গায় চোখ ফেলল।

…সাত বছর পরে এই আমার প্রথম চিঠি এবং হয়ত শেষ চিঠি, মনে রেখ কথাটা। ভালোবাসা নিও। বিনীতা।

ভালোবাসা কথাটা ব্যঙ্গ না সরলতা কিছুই শেষ পর্যন্ত মীমাংসায় এলো না। এমন সময় সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ হতেই তাড়াতাড়ি চিঠিটা পকেটে রেখে আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়ল নিঃশব্দে।

ঘরে ঢুকল বিনীতা নিজে। একটা লাল পাড় গরদের শাড়ি পরনে, হাতে কঙ্কন। ভিজে চুলের গুচ্ছ পিঠের উপর রাশ করা।

শোভন তাকে দেখে উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করলে বিনীতা ডান হাত তুলে মুচকি হেসে বলল, সিট ডাউন প্লিজ!

ঘরের কোণ থেকে একটা টুল টেনে এনে মুখোমুখী বসে পড়ে বলল, শেষ পর্যন্ত তাহলে এসে পড়লে সত্যিই।

শোভন গম্ভীর গলায় বলল, তুমি কি সত্যি সত্যিই আসতে লেখনি?

বিশ্বাস কি। শোভনের গাম্ভীর্য দেখে হেসে ফেলে বলল, অভিমান হল নাকি আবার।

তেমন ভাগ্য করে নিশ্চয়ই আসিনি। তারপর আছ কেমন?

আছ কেমন? সত্যি সত্যিই জানতে চাও? সুখে আছি, সুখে আছি, সখা আপন মনে।

ওটা নার্শিসাসের কথা, তোমার স্বমগন সুখের কথা জানতে আসিনি, সেটা ওপন সিক্রেট। গান চলছে, কেমন?

না, বিনীতার মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। সুখের আভায়

মুখ-চোখ চকচক করছে, সারা শরীরটাই যেন আনন্দে সপ্রতিভ। কেমন হাল্কা মেজাজে কথা বলছে। পুরনো বন্ধুকে দেখে সত্যিই খুশি হয়েছে। ভাবতেই পারেনি সত্যি সত্যি আসবে শোভন, সত্যি সত্যি তার সামনে এসে দাঁড়াবে।

বিনীতা যেন আরো সুন্দরী হয়েছে, একটু মোটা হয়েছে। তা হোক, রেখা মন্থর শরীরে যেন আরো বিচিত্র স্বচ্ছলতা এসেছে।

এই বাড়িতেই ?

হ্যাঁ, এই বাড়িতেই। তারপর সুখে আছো তুমিও নিশ্চয় ? বিনীতার দুচোখে কৌতুক—তোমার বাড়ির খবর কি ?

অন্তত অসুখে থাকবার মত কোন কারণ ঘটেনি। শহর কলকাতা ছেড়ে দিয়েছি। গড়বেতা জায়গাটি চমৎকার। একদিকে সুবিস্তীর্ণ খোয়াই, অন্যদিকে ঘনপিনদ্ধ শালবন, বালি মাটির গুণই আলাদা। শরীর নিশ্চয়ই আগের চেয়ে এক পশলা ভালো হয়েছে—দাঁত বের করে হাসলো শোভন—তাছাড়া দুশো সতের টাকা আট আনা মাইনে পাই, কিছু লুকোবো না।

বিনীতা একটু আহত হল। কিন্তু পরক্ষণেই আগের মত হেসে বললো, বেশ বইয়ের ভাষায় কথা বল আজকাল।

সাধু লোকের ওই একটি মাত্র ভাষাই আছে, যদি গ্রন্থকীট বলো, তারও অন্য কোন ভাষা নেই।

তুমি একদিন কবিতা লিখতে শোভন, মুখে আঁচল দিয়ে খিলখিল করে হাসলো, তোমার বাড়ির নতুন লোকটি জানে না সে কথা ?

লিখে তোমাকে যে হাসিয়েছি এই যথেষ্ট, অন্য লোক হাসানোর স্পৃহা আমার নেই।

শুনে আমার গর্ব হচ্ছে।

বলে আমারও। তোমার ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি এখনো।

সম্ভব নয়, ভদ্রলোক পালিয়েছেন, লোকটা বড্ড ভীতু কিনা।

আমি আসবো শুনে?

বিনীতা উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ির রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে হাতের ইসারায় কাকে যেন ডাকলো, তারপর একটু পরে আবার ফিরে এলো।

তারপর কিছুদিন থাকা হবে তো? একেবারে অন্য গলায় কথা বললো বিনীতা।

আজ্ঞে না, দিন তিনেকের বেশি নয়। লক্ষ্ণৌতে যাবার ইচ্ছে···

সেখানে কি?

এক জন বন্ধু আছে। বহুকাল দেখা সাক্ষাৎ হয়না। যেতে লেখে প্রায়ই—

লিখুক। এখন তো গ্রীষ্মের ছুটি, সময় তোমার যথেষ্টই আছে। আমাদের বাড়িতেই যখন প্রথম এসেছ তখন আমাদের দাবীই আগে। আর অতিথিসেবায় যে কোনরকম ত্রুটি ঘটতে দেবনা, না বললেও তোমার সেটা বিশ্বাস করা উচিত ছিল। নাও, এখন স্নান করে নেবে চল, পরে কথা হবে। এত বেলায় তেতে পুড়ে এসেছ, রাত জেগেছ নিশ্চয়, খাওয়াও হয়নি, তোমার স্বভাব আর জানি না! ওরে শ্রীনিবাস এলি?

একরাশ শুকনো জামাকাপড় নিয়ে শ্রীনিবাস দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো।

বিনীতা শ্রীনিবাসকে দেখেই জ্বলে গেল। ওগুলো তো বাথ-রুমেই রেখে আসতে পারতিস, আবার ওপরে টেনে নিয়ে এলি কেন? আচ্ছা যা, বাবুকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দে।

কোন দরকার ছিল না কিন্তু এসবের। আমি সঙ্গে যথেষ্ট জামা-কাপড় এনেছি।

সে যথেষ্ট জামাকাপড় তুমি তোমার লক্ষ্ণৌতে গিয়ে ব্যবহার করো, এখানে চলবে না। এখানে থাকবে ভদ্রলোকের মত ধুতি

পাঞ্জাবী পরে, এ বাড়িতে ওসব খ্রীস্টানীপনা বরদাস্ত করা হবেনা, বুঝেছ?

শোভনের ট্রাউজার্সের দিকে ভ্রূকুটি করে বিনীতা থামল। শোভন লজ্জিত হয়ে বলল, আশ্চর্য, তোমার মার কথা একদম মনেই ছিলনা আমার, ছি-ছি। চল আগে তাঁকে প্রণাম করে আসি, তিনি এখন কোথায়, ঠাকুর ঘরে?

ছি-ছি হবার কিছু নেই। সবাইকে তোমার মনে থাকবে এমন আশা আমি অন্তত করিনা। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কথাটার অন্তর্নিহিত কটাক্ষ স্পষ্ট হতে দিল বিনীতা। তারপর মৃদু হাসি গোপন করে বলল, তাছাড়া তিনি এখন তোমার প্রণামের নাগালের বাইরে।

পাংশু মুখে শোভন বিনীতার মুখের দিকে তাকাল। তার অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে বিনীতা না হেসে পারল না।

ভয় নেই, কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। মা দিল্লীতে দিদির কাছে আছেন। এই ছোট মেয়ের চেয়ে বড় মেয়েকেই তাঁর বেশি পছন্দ, তোমার মত নয়। যাক, তোমার প্রণাম আমার কাছে জমা রেখে যেতে পারো, বাজে খরচা করে ফেলব না, ফিরে এলে মাকে পৌঁছে দেব। যাও স্নানে যাও, যথেষ্ট বেলা হয়েছে।

শ্রীনিবাস তোবড়ানো মুখে মুচকি মুচকি হাসছিল। শোভন তাকাতেই মস্ত একটা ঢোঁকের সঙ্গে চোরা হাসিটা যেন আস্ত গিলে ফেলল, এঁজ্ঞে আসেল বাবু—

তুই চন্দ্রবিন্দুগুলোর লোভ ইহকাল পর্যন্ত একটু সংবরণ করে থাক বাবা, যখন সোজা গিয়ে তাল গাছে চড়বি—

শেষ কথাটুকু শোনা গেল না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বিনীতা পাশের ঘরে চলে গেল ছাদের দরজা খুলে।

সারাটা দিন যেন প্রবল জ্বরের ঘোরে কেটে গেল। কি উত্তাপ, কি অসহ্য জ্বালা।

বাইরের আকাশ-বাতাস আগুনে ঝলসে গেছে, তামা-রঙ বাষ্প উঠেছে গোটা বেনারসের উঁচুনিচু ছাদের শিখর থেকে। তাকানো যায় না সেদিকে। আগ্নেয় দিগন্তের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে সমস্ত শহর, তার জানলা-দরজা নিশ্ছিদ্র করে বন্ধ করে। কত টেম্পারেচার উঠেছে কে জানে। পাথর তেতে উঠলে ভীষণ গরম হয়, বেনারসে অধিকাংশই পাথরের বাড়ি।

ঘিঞ্জি গলিতে একতালা গুলোই যা এসময়ে কিছু সুখের। গলির পেটের তলায় কস্মিনকালেও রোদ পৌঁছায় না, দু-একটি জায়গায় ছাড়া এবং তাও সেই মধ্যদিনে, মাথার উপরে সূর্য উঠলে। অন্ধকার আর স্যাঁৎসেঁতে একতলার ঘরগুলো এই অগ্নিকাণ্ডের সময়ে যা কিছু লোভনীয়।

কিন্তু ওপরের তলাগুলো ফায়ার স্টোনের মত দেওয়ালে-ছাদে আগুন পুষে রাখে। অবৈজ্ঞানিক রীতিতে তৈরি জরদ্গব বাড়ি গুলোয় একেই যথেষ্ট পরিমাণে ভেন্টিলেশনের অভাব, তার ওপর এই উগ্ররোদ। মনে হবে আগ্নেয়গিরির গুহায় বাস করছি।

সকাল আটটার পর থেকে জনরেখা কমতে থাকে। সাড়ে নটার পর থেকে দরজা-জানলা বন্ধ হতে শুরু হয় এবং সাড়ে দশটা এগারটার ওপারে গিয়ে এ অঞ্চলের বেনারসের অবস্থা আনন্দমঠের সেই পদচিহ্ন গ্রামের রূপ নেয়। পথে লোক নেই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত অটলমূর্তি ষাঁড়গুলোও কোথায় যে লুকোয় তার ঠিক নেই।

সরু, অতি সরু স্নায়ুরেখার মত বাঙালীটোলার গিরিখাত সদৃশ গলিগুলোর তলায় তলায় জীবনের ক্ষীণধারা বইতে থাকে, স্রোত হীন, স্তিমিত মন্থর। স্যাকরার দোকানে হয়ত একটু ঠুক্ ঠুক্ কাঠ ঠোক্‌রা আওয়াজ ওঠে, দরজির দেকানে মেশিনের ভ্রমর গুঞ্জন।

দু-একটা কথা শোনা যায়, একটু বচসা কি হাসির হল্লোড়। তারপর সব চুপ, সব থিতিয়ে যায়। ময়রার দোকানে মাছি ভন ভন করে, দি স্টাইল হেয়ার কাটিং সেলুনে কাঁচি গুলো সম্পূর্ণ নীরব, একটা ক্ষুর কখনো-সখনো চলে কি চলেনা। দেওয়ালে টাঙানো পারা-চটা বড় বড় আয়নার চতুষ্কোণ বুক থেকে ছবিগুলো মুছে যায় একে একে।

শোভনের তন্দ্রামন্থর চোখছটিতে কিছুতেই ঘুম জমছিল না। গরমের জন্যে নয়, তিনতলায় হলেও এই ঘরটিতে বেনারসের সম্পূর্ণ উষ্মা প্রকাশ পায় নি। একঘণ্টার মধ্যেই শ্রীনিবাস ঘর-খানাকে ছায়াঘর বানিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু যে ছবির মত সাজিয়ে দিয়ে গেছে তা নয়, জানলায়-দরজায় খসখস টাঙিয়ে পিচকিরি করে ভিজিয়ে দিয়ে গেছে।

পাখা ঘুরছে। অন্ধকার ঘরের সিলিংয়ে তার স্ফুলিঙ্গ এবং পাখার সাদা আভা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এককোণে টুলের ওপরে ফুলদানী, একগুচ্ছ রজনীগন্ধা তার বুকের মধ্যে গোঁজা। এই টুলটার ওপরে বিনীতা এসে বসেছিল প্রথম।

বাতাসে ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে ভিজে খসখসের ভেষজ ঘ্রাণ মিশে যে আবহাওয়া জমিয়ে তুলেছে তাতে ঘুমের নিমন্ত্রণ ছড়ানো। নরম বিছানায় শীতলপাটী। শোভনের ক্লান্ত দেহ যেন শ্যাওলার স্তরে আটকে গিয়ে ভাসছে। আর তাই ঘুম আসছে না।

ঘুম আসছে না, ঠিক সেজন্যেও বোধহয় নয়। বিনীতাকে দীর্ঘ সাতবছর পরে দেখে শোভন আজ বিহ্বল হয়ে পড়েছে। বিনীতাকে একদিন দূরে সরিয়ে রেখেছিল সে, মন থেকে জোর করে তার ছবি মুছে ফেলেছিল, কিছুটা ভয়ে কিছুটা বিবেকের দংশনে।

আজ আবার সেই ছবি মনের মধ্যে জোর করে প্রবেশ করছে। এখানেও বিবেকের জ্বালা রয়েছে অবশ্য। বিনীতা এখন পরস্ত্রী, একথা শোভন যেন ভাবতেই পারে না, ভাবতে কষ্ট হয়। প্রথম

বিনীতাকে সেই আবিষ্কার করেছিল, যে রূপাবলীর মধ্যে বিনীতাকে কেউ কখনো দেখেনি, এমনকি বিনীতার স্বামী সন্তোষও না, তার আবিষ্কর্তা শোভন নিজে। কিন্তু তার সেই প্রথম অনুভব যথাসময়ে প্রকাশ করতে পারে নি, প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। অতীতের একটু ভুলে সমস্ত দাবী আজ অগ্রাহ্য হয়ে গেছে যখন, ঠিক তখনই মনে হল বিনীতাকে ছাড়া শোভনের জীবন ব্যর্থ; জীবনের উন্নতি-অবনতি চাওয়া-পাওয়া, দিন যাপনের জন্য ইতস্তত সঞ্চরণ অর্থহীন।

মনের মানুষ ঘরে না এলে, ঘরের মানুষ মনে আসে না। বিনীতার সঙ্গে শোভনের মনের যে দাম্পত্যসম্পর্ক একদা স্থাপিত হয়েছিল, সাত বছরের শারীরিক বিরহে তা মুছে যায় নি। মুছে যাওয়া অসম্ভব। আজই প্রথম টের পেল, তুষের আগুনের মত কোন এক অজ্ঞাত-কারণ-দুঃখে তার মনের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল এতদিন, শান্তি পাচ্ছিল না কিছুর মধ্যেই।

গড়বেতার কলেজমেসের নিঃসঙ্গ জীবন নানা কাজের মধ্যে দিয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল—পড়াশোনায়, টিউশানিতে। প্রতিবছর দু-চারটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, নাট্যপরিচালনায় ছাত্রদের বন্ধু হয়ে উপদেষ্টা হয়ে শোভনের দিনগুলো তরতর করে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তলায় তলায় যে চঞ্চলতা, যে অস্থৈর্য, তাতে যে আসলে শোভনের জীবনের গোপন বেদনারই স্পর্শ সংলগ্ন হয়েছিল, নিজেও সে ভাল করে এতদিন ধরতে পারে নি।

আজ স্নান করে আসার পর যখন বিনীতা নিজে সামনে বসে থেকে পীড়াপীড়ি করে এটা-ওটা খাওয়াচ্ছিল, তখন হঠাৎ এবাড়ির প্রথম দিনটির কথাই মনে পড়ে গেল। দিদিমা কাশীতে থাকতেন তারও প্রায় একযুগ আগে থাকতেই। শোভন আগে কখনো আসেনি। কিন্তু মা মারা যাবার পরে দিদিমা তাকে কিছুকালের জন্যে নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখেন। সেই থেকে বেনারসের সঙ্গে শোভনের একটা অন্তরের যোগাযোগ ঘটে যায়। কিন্তু সে

যে কেবলমাত্র বেনারসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তা নয়, দিদিমার স্নেহ-যত্ন এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে সে তার হারানো মাকেই যেন চমকে চমকে ফিরে ফিরে পেয়ে যেত। মাকে মনে পড়া, অন্তত এ রকম ভাবে, শোভনের কাছে কান্নার সামগ্রী হলেও লোভনীয় ছিল।

চোখে জল এলেই সে পথে বেরিয়ে পড়ত। বিরাট বিরাট ঘাটগুলি, ঘাটের খাড়া ওপরে দাঁড়ানো প্রাসাদগুলির দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে বসে থাকত। সেই বয়সে, ভারতের এই প্রাচীনতম শহরের সময় পিছলানো ঘাটগুলি এবং ঘাটের পিছনকার অসংখ্য ঘটনার উপসাক্ষী, একাধারে দুর্গ এবং প্রাসাদ কি ভাব জাগাতো, সে নিজেও ভালো করে জানত না। মণিকর্ণিকা, হরিশ্চন্দ্র ঘাট যখন চিতা বুকে নিয়ে ধূধূ জ্বলত, মানসিং মানমন্দিরে যখন রোদছায়ায় মিশে দিনের বলিরেখা তৈরি হত পাথরের ঘড়িতে, তখন শোভনের শূন্য বুকের মধ্যে হয় ঘুঘু ডাকতো, নয় ত কলকাতার কোন সরীসৃপ গলির চমকপ্রদ বাসনওয়ালার ঘণ্টা বেজে উঠত উদাস সুরে। মার জন্য মন কেমন করে উঠত। ইতিহাসের ঝাপসা ছায়া মুছে যেত তার বিস্মিত চোখ থেকে। বিন্দুমাধবের ধ্বজগৌরবকে ম্লান করে দিয়ে বিধর্মীধ্বংসী ঔরঙ্গজেবের ধরেরা কি জ্ঞানবাপী তখন আর মুঘল-কোলাহলকে বড় করে তুলতে পারত না। পড়ে থাকত কাশীর বিখ্যাত কচৌড়ি গলি কি বিশ্বনাথের মন্দির, শোভন উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ফিরতো। কেবলি মনে হত ঘরে ফিরে দিদিমাকে আর দেখতে পাবে না, যেমন মাকে একদিন পায় নি।

সেদিনও বাড়ির দেওয়ালে লালনীল রঙে আঁকা পল্টনের ছবি দুটি দেখেই বাড়ি চিনে নিত শোভন। তারপর পুজোর ছুটিতে কি গ্রীষ্মের বন্ধে যতবার এসেছে, পল্টনের ছবি দুটোকেই আগে খুঁজেছে, তারপরে বাড়ির দরজা। তার মানে এই নয় যে, তখনও ভুল হবার সম্ভাবনা ছিল, আসলে তার মানে হিসেবে তেমন কিছু নেই। শুধু পল্টন দুটিকে মনে হত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা এ বাড়ির কেউ।

সে প্রথমদিনের কথা। এবাড়ির প্রথমদিন নয়, শোভনের জীবনের একটি স্মরণীয় প্রথমদিন। দিন পনের হবে শোভন প্রথম কাশীতে এসেছে। দুপুরে দিদিমাকে মহাভারত এবং রাত্রে রামায়ণ পড়ে শোনানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখে, নয়ত ঘাটে গিয়ে ভাগবত পাঠ শোনে চুপ করে বসে।

ঘাটে অবশ্য দিদিমার সঙ্গেই আসতো, বাড়ি চলে যেত নিজের খুশিমত একা একা। কলকাতার বন্ধুদের জন্যে মন কেমন করত, মায়ের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত এই পর্যন্ত। এ ছাড়া তার আর করণীয় কিছু ছিল না। নিয়মরক্ষার্থে সঙ্গে আনা পাঠ্য কেতাব এক আধবার সকালে সন্ধ্যায় খুলে বসত কিন্তু কালো পিঁপড়ের মত ছাপা অক্ষরগুলো তাদের খুশিমত ঘুরে বেড়াত তার ঝাপসা চোখের সামনে দিয়ে।

এমনি একদিন দিদিমার সঙ্গে ঘাটে গিয়েই হঠাৎ ফিরে চলে এল বাড়িতে। তখন গাঢ় বিকেল। ঘরের চাবি হাতে নিয়ে সবে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে অমনি বেশ জোরে শব্দ করে কে যেন সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। পড়ে গেল একেবারে উঠোনের সেই ছায়াধরা কোনটাতে, যেখানে কোন সময়েই জল শুকোয় না বলে দু-চারদিন অন্তর অন্তর ঘন সবুজ শ্যাওলা জমে ওঠে।

শব্দটা শুনে শোভন প্রথমটা ভীষণ চমকে গিয়েছিল। বিকেল বেলায় বোধহয় কবরখানাও এ বাড়ির চেয়ে বেশি নির্জন হয় না। একতলা এবং দোতলায় সমস্তই বিধবা এবং বৃদ্ধার দল ভাড়া থাকেন। তাঁরা সবাই গঙ্গাযাত্রীর দল। অন্তত মনে মনে নিজেদের তাই বিবেচনা করেন। কেউ আগে যাবেন কেউ বা পরে, তফাৎ এই যা। সকালে বিকালে তাই তাঁদের গঙ্গার ঘাট এত বেশি করে টানে। প্রতিদিনের আহারের মতই প্রতিদিনের এই পুণ্যসঞ্চয়। ঠিক এই বিকেল বেলটায় তাই তাঁদের কেউ থাকেন না।

ভৌতিক ব্যাপার মনে করে প্রথমটা তার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলেও, একটি সরু গলার চাপা কান্না শুনতে পেল সঙ্গে সঙ্গেই। ভয় দেখানো নাকি গলার কান্না নয়, এবং সেই অসহায় আহত কণ্ঠস্বর শুনলে অভয় দিতে ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে।

ভাল করে কিছু দেখবার বা ভাবরার আগেই শোভন ছুটে গেল সেই দিকে, তারপর মনে সাহস সঞ্চয় করে, যে পড়েছিল তাকে টেনে তুলে বসালো।

মুখের দিকে তাকিয়ে আর একবার চমকালো শোভন। তার দেহের সমস্ত শিরাউপশিরার মধ্যে দিয়ে রোমহর্ষক রক্তের স্রোত বয়ে গেল একঝলক। এক অদ্ভুত অনুভূতি তাকে ছুঁয়ে রইল। মেয়েটি তারই সমবয়সী। তার পাতলা ঠোঁট দুখানা তখনও থরথর করে কাঁপছে ব্যথায় এবং ভয়ে, কিন্তু গলায় সেই কান্নার আওয়াজ নেই। চোখের কোলে একফোঁটা জল, সাদা সিল্কের ফ্রকটা হাঁটুর ওপরে অনেকটা উঠে গেছে, ভিজে লেপ্টে গেছে তার হাতির দাঁতের মত সুডোল মোম-রঙা পায়ের সঙ্গে। আর কিছু স্পষ্ট করে নজরে পড়ে নি তখন।

তার সমবয়সী অপরিচিত একটি মেয়েকে এরকম একা-একা নিঃশব্দে অযাচিতভাবে ছুঁয়ে ফেলায় অপরাধ হয়েছে না বিহ্বল আনন্দে সে ভয় পেয়ে গেছে, ভেবে পেল না। মেয়েটি তার দিকে একভাবে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। তার ঈষৎ উন্নত বুকের দ্রুত ওঠাপড়া, কোঁকড়া কোঁকড়া সুগন্ধি চুলের রাশ, উজ্জ্বল একসার ঝিনুকের বোতামের মত গোল গোল দাঁত ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, পদ্মের গন্ধের মত মৃদু সুরভিত নিশ্বাস, সব মিলিয়ে শোভন শেষ পর্যন্ত যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ; অনেকগুলো রঙ যেন মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

একটা হাত পিঠের দিকে ঘাড়ে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের মধ্যে আর এক হাতে মেয়েটির একটা হাত সবলে ধরেছিল শোভন,

এটা আমাদেরই বাড়ি। আসলে আমরা থাকি ভাগলপুরে। বছরে একমাস থাকি এখানে—গ্রীষ্মের ছুটিতে, পুজোর বন্ধে, এই রকম।

অ, তাই দেখিনি! লজ্জিতভাবে শোভন বলল, মানে, আমি এখানে নতুন এসেছি কিনা!

আরে, আমিও তো কাল এসেছি মাত্র।

মেয়েটির গলায় সরল রিনরিনে স্বর। শোভন ঘাড় নেড়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতেই মেয়েটি আবার কথা বলল।

কোথায় যাচ্ছো এখন, বেড়াতে বুঝি? ক্যারম খেলা জানো?

শোভন প্রতিটা প্রশ্নের জন্য একবার করে ঘাড় নাড়ল। বেশি কথা তার আসেনা, লজ্জাও করে।

ফাইন! যাক, নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম বাবা! চলো, তাহলে ক্যারম খেলি গে ওপরে গিয়ে, চলো চলো।

স্বর্গের সিঁড়িটা সেই প্রথম আবিষ্কৃত হল শোভনের কাছে। নীল নির্জন আকাশ, রোদে ঝকমক ছাদ। তারপর দিনের পর দিন কতভাবে কেটে গেছে, কখন ক্যারমে কখন লুডোতে। বিনীতার নাম জানা হয়েছে, কোন ক্লাসে পড়ে, তাও। মেয়েটি আসলে ভালই। বড়লোক বলে কোন অহংকারই নেই। তবে মাথায় একটু ছিট আছে। নিজের খেয়াল-খুশি মত চলে, কাউকে কেয়ার করেনা।

শোভনের হদিসও কিছু অজানা থাকেনি বিনীতার কাছে। কিন্তু সেদিনের সেই ছায়া ছায়া শ্যাওলাধরা উঠোনে যে পুতুলগুলো ছড়িয়ে গিয়েছিল তাদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি।

এমনি করে কয়েক বছর কেটে গেল। ছুটিতে দেখা হয়, আবার ছুটি ফুরোলে দুজন দুদিকে। একজন কলকাতায় চলে যায়, একজন ভাগলপুরে।

যখন বেনারসে আসে তখন দিনগুলোর চরিত্রই যায় বদলে।

সেই উদ্দাম গ্লানিহীন দিনগুলো, মধুর স্বপ্নবিভোর ফুলের গন্ধের মত দিনগুলো, জীবনের স্বতন্ত্র মূল্য এনে দিত।

বিনীতার বাবা লোকটা অদ্ভুত। মেয়েকে তিনি এমন অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন যা অনেক ছেলের পক্ষেও পাওয়া কঠিন। মেয়ের সঙ্গে তাঁর যেন বন্ধুর সম্পর্ক। উপদেশ তিনি দেন না, প্রয়োজন মত অভিজ্ঞতা যোগান মাত্র। বিনীতাও তার বাবার কাছ থেকে একটি জিনিসই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, সেটি তার মনের সব অবস্থায় সহজ হবার শক্তি। এই বয়সেই এ স্বভাবটা আশ্চর্য লাগে। মাথার ছিট ভাবতেও দ্বিধা হয় না। তার মনের মধ্যে যেন কোন জটিলতা নেই, আলোছায়ার আড়াল আবডাল নেই। যা মনে আসে তা অনায়াসেই মুখেও আসে।

বিনীতার বাবা মেয়ের ওপরে যেটুকু শাসন করেন, কড়া নজর রাখেন, সে শুধু গানের বিষয়ে। তুজন মাস্টার পাল্টা-পাল্টি দিনে এসে একাধিক ঘণ্টা বিনীতাকে নিয়ে বসেন। তখন ওপরের ঘরে শোভনের প্রবেশ নিষেধ থাকে। এবং সকালের আর রাত্রের যে বিশেষ সময়টা বিনীতার রেওয়াজ করবার জন্যে নির্দিষ্ট, সেই অসম্ভব রকম দীর্ঘ সময়টা শোভন ওপর তলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় না। বাড়ালেও একটু বেশি করেই বাড়ায় অর্থাৎ সোজা ছাদে চলে যায়। একাএকা কিছুক্ষণ রাতের অন্ধকারে বা ভোরের আলোয় ঘুরে বেড়ায় ছাদের উপর।

কিন্তু তারপর ? তারপরেও তো দিনের রাতের অনেকটা সময় না-খরচা থেকে যায়। তার ওপরে কারও তর্জনী তোলা নেই, কোন কাজের দায়িত্ব চাপান নেই। তখন অফুরন্ত ছুটি, অবাধ স্বাধীনতা। কেউ ঘরের ভেতরে বুড়ো বটের মত গম্ভীর হয়ে বসে থাকেনা, দেওয়ালে চোখ-কান রেখেও কেউ আড়ালে সরে থাকে না। ধীরে ধীরে তুজনের মধ্যে যে সহজ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল, চালচলন কথাবার্তা বেয়াড়া ধরনে চললেও, আসলে তার মধ্যে একটা

পরিমিত মাত্রা টানা ছিল। বিনীতার স্বভাবটাই ছিল ছটফটে, চেঁচিয়ে হাসতে কি হাত ধরে টানতে তার কিছুই মনে হত না। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা আশ্চর্য নিস্পৃহতা ছিল যা তাকে একটি আবরণ দিয়েছিল। মাঝে মাঝে যার জন্যে শোভন নিজেকে অসহায় ভাবত।

এই সময়ে শোভন লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেছিল। রঙ আর তুলি হাতে নিয়ে অনেক সময় কাগজের সামনে চুপচাপ বসে থাকত। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এর হয়ত অন্য অর্থ করবে কিন্তু আমরা শোভনের স্বভাবকে তো জানি! যে মুখচোরা, গান তাকে টানে না। যে অত্যন্ত বেশি নির্জন, সে অনেক সময় কথার পরে কথাও হয়ত সাজাতে যায় না। কারণ, কথা মানেই তো সংলাপ, কাউকে না কাউকে শুনিয়েই তার সার্থকতা, সে যতই গোপন কবিতা হোক না কেন। সুতরাং অবাকপটুদের জন্যে পটুয়াগিরিই যথার্থ আচরণ। মনেব মধ্যে রঙের খেলা চলে, অন্যের জন্যে নয়, নিজেকেই নিজে আস্বাদন করবার এই রীতি। রঙ নির্জন, রঙ নিঃশব্দ, রঙের কোন উচ্চারণ নেই। অথচ রঙের মধ্যে ছন্দ আছে, আছে সুর: আলোর পরে আলো এসে মিশেছে রঙের মধ্যে, একেই হয়ত বলে রস, আমাদের দেহের মধ্যে যেমন করে ছড়িয়ে চলেছে রক্ত, বেজে চলেছে সুর।

তারপরে সুর কাটল একদিন। সে আজ থেকে সাত বছর আগের কথা। দিদিমার অসুখের সংবাদ পেয়ে শোভন ছুটে এসেছে বেনারসে। সময়টা ভাদ্রের মাঝামাঝি। বিনীতা তখন এবাড়িতে নেই। ভাগলপুরে। গ্রীষ্মের বন্ধে বিনীতা এবারেও যথারীতি এসেছিল কিন্তু শোভন আসতে পারেনি কি কারণে যেন। মনটা নানাকারণেই খারাপ। সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা, বন্ধুরা ডুব দিয়েছে বইয়ের পাতার মধ্যে। কিন্তু শোভন শান্ত-ভাবে বইয়ের কাছে পর্যন্ত যেতে পারেনা। কী এক অশান্তি ঢুকেছে

মনের মধ্যে। একটা যুগান্তর আসছে যেন। জীবনটা এইবার একটা কঠিন আঘাতে পাল্টে যাবে, তার সূচনা দেখা দিয়েছে। ঘরে বিমাতা আসবার পর থেকেই বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসতে শুরু করেছে। আঘাত আসছে সামনে। বাতাসে যেন সেই আসন্ন পরিবর্তনের গন্ধ পেয়ে গেছে শোভন। একতাল কাদামাটির মত তার সমস্ত চৈতন্য—শুধু চৈতন্য নয়, তার সমস্ত ভীরুতা, সেই আঘাতের অপেক্ষা করছে। বিনীতা রয়েছে এই চিন্তা আর দুশ্চিন্তার মাঝখানে। যে বন্ধুত্বকে সে অনায়াসেই হাত বাড়িয়ে পেয়েছে একদিন, তার জন্যেই কিরকম আশ্চর্য একটা বেদনা যেন বুকের তলায় বাসা বেঁধেছে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দিদিমা মারা গেলেন। বাকি বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে দিল শোভন। ঘর ছেড়ে দিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে গেলনা। ধর্মশালায় গিয়ে উঠল। ইচ্ছে কয়েকদিন বেনারসে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে।

দিদিমার রামায়ণ আর মহাভারতখানা মাঝে মাঝে খুলে বসে রাত্রে কিন্তু পড়তে পারেনা বেশিদূর, চোখ আসে ঝাপসা হয়ে। বাইরে বেরিয়ে পড়ে তখন। পাক যন্ত্রের মত বিসর্পিল কুণ্ডলী পাকানো গলির ফাঁসের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে পাক খায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

মৃত্যুকে এক বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে শোভন। মায়ের মৃত্যু সংবাদ যেন এতদিন পরে প্রথম জানতে পারল। দিদিমাই তাকে দিয়েছিলেন একাধারে মাতৃস্নেহ এবং আশ্রয়। কারণ, বাবার কাছে কোন দিনই শোভনের কোন নিকটদাবী ছিল না। সৎমা আসবার পর থেকে দূরত্ব আরও বেড়েই গিয়েছিল ইদানীং।

এমনি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে বিনীতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। গোধুলিয়ার মোড়ের কাছে। বিনীতা, সেই বিনীতা, কিন্তু মুখে একটা যেন ম্লান হাসি ফুটে উঠেছে।

বলল, আরে তুমি! বেনারসে আছ এখনও? আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছ শুনলাম।

চলেই যাবো। বোধহয় দু-একদিন এখনো আছি। বেনারসের সঙ্গে সকল সম্পর্ক কাটাতে একটু দেরি হয়ে গেল।

শুনে ধন্য হয়ে গেলাম। অভিমান ভরা গলায় বিনীতা বলল, আগে বল এখন আছ কোন চুলোয়?

সমস্ত শুনে এবং সমস্ত ওজর আপত্তিকে উৎখাত করে শোভনকে নিয়ে সেই চুলোর দিকেই ছুটল বিনীতা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বামাল সমেত শোভনকে আবার বাঙালী টোলার গলিতে ফিরিয়ে আনল। শুধু ফিরিয়েই আনল না, টেনে তুলল সটান তিনতলায়। তিনতলার ঘরে শোভনের থাকবার ব্যবস্থা করবার ছুটো কারণ ছিল। প্রথম কারণ, ভাড়াটে হিসাবে শোভনকে আর ফিরিয়ে আনা হয়নি। দ্বিতীয় কারণটা একটু অস্পষ্ট। যবনিকা কেঁপে উঠেছে। বোধহয় উইংসের পাশ থেকে বাঁশিও বেজে উঠেছে, পর্দা নেমে আসবে এইবার।

হঠাৎ একদিন বেড়াতে বেরিয়ে ফেরবার সময় চৌষট্টি ঘাটের চত্বরের এককোণে দাঁড়িয়ে শোভনের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল বিনীতা।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে গঙ্গার ওপর। শোভন চমকে উঠল। হাতের এই আকস্মিক ছোঁয়ার মধ্যে দিয়ে বিনীতা যেন কি কথা বলতে চাইছে। অন্ধকারের মধ্যেই তার মুখের দিকে তাকাল, চোখের ভাষা পড়া গেল না। মুখে কোন কথা বলল না বিনীতা। মনে হল, কথা বলবার ভাষা সে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু হাতের মুঠোটাকে শক্ত করল আর একটু। শোভন অস্বস্তি বোধ করল। চারপাশে তাকিয়ে কথা বলবার জন্যেই যেন বলল, তোমার তো পরীক্ষা চুকে গেল এইবার?

সেই কথাই তো বলতে চাইছি।

শোভনের আশঙ্কাটা ঘুরে এল অন্য পথ দিয়ে। শোভন অন্য-মনস্ক ভঙ্গী করে বলল, হ্যাঁ, পাটনা ইউনিভার্সিটি এদিক থেকে অনেক ভাল। আমাদের......

শোভন! ধরাগলায় বিনীতা তাকে থামিয়ে দিল।

থতমত খেয়ে চুপ করে গেল শোভন। বুঝল সব কথাই আজ অচল হয় যাবে। ঝড় আসবেই, তাকে ঠেকান গেল না। মনে মনে ক্লান্তির শেষ সীমায় এসে পড়েছে বিনীতা। এই কথাটা অবশ্য শোভন তখনও ঠিক ধরতে পারে নি। যে রকম ক্লান্ত হলে মানুষ শর্টকাট রাস্তা খুঁজতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

শোভন, আমার জন্যে রাজপুত্র আসচে শুনেছ?

কই, না তো। শোভন কৃত্রিম খুশিভরা গলায় বলল, কোথা থেকে?

রাজপুত্র এদেশেরই, তবে বিলেত ঘুরে কুলীন হয়ে আসচেন।

বটে বটে, এ তো খুবই সুখের কথা।

অনেক দুঃখেও হেসে ফেলল বিনীতা। ধরা গলায় শেষে বলল, খুবই। আমাদের তাহলে আনন্দ করা উচিত কি বল, উৎসব?

নিশ্চয়, একশবার। যাক, তোমার তাহলে এতদিনে সত্যিই বিয়ে!

মেয়েদের কি মিথ্যে মিথ্যে বিয়ে হয় কখনও? আর আমি যখন মিথ্যে মিথ্যে মেয়ে নই। কিন্তু আমি ভাবছি, তুমি আজ আমাকে এতবড় ঠাট্টা করতে পারলে কি করে!

আমি ঠাট্টা করিনি বিনীতা। তুমি সুখী হবে, একি আমার কাছে ঠাট্টার বিষয়! বরং যদি পারতাম—

যদি পারতাম? কী বল, চুপ করে যেও না।

তোমাকে তাহলে ঈর্ষাই করতাম বিনীতা। কিন্তু আমি তাও পারি না, তোমাকে ঈর্ষা করা আমার ভাগ্যে লেখেনি।

ভাগ্য কে লেখে ?

কেউ লেখে নিশ্চয়ই। তুমি সুখী হও।

গঙ্গার জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। দিগন্ত জুড়ে সীমাহীন অন্ধকার। দূরে হরিশ্চন্দ্র ঘাট রক্তমুখী নীলার মত। একটি চিতাকে কেন্দ্র করে চারপাশের অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে। কুকুর ডাকল তীক্ষ্ণ গলায়। অনেকক্ষণ কথা বলল না বিনীতা। নিশ্বাসের শব্দ ঘন হয়ে উঠেছে। গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠের মূর্তির মত। হঠাৎ নড়ে উঠল : আমি সুখী হবো একথা তোমাকে কে বলল। অর্থে আমার রুচি নেই শোভন। টাকার মধ্যেই জন্মেছি আমি কিন্তু তা বলে আবার সেখানেই মরতে পারব না আমি। আমাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হচ্ছে।

দেওয়া হচ্ছে ?

হ্যাঁ, বাবার ইচ্ছে।

এ তোমার ভুল ধারণা বিনীতা। তোমার বাবা তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তোমার মঙ্গলের জন্যে এ ছাড়া আর কি তিনি করতে পারেন ?

মঙ্গল ? তা হবে। হাসল বিনীতা। আমাদের রাজপুত্রের টাকা আছে অনেক, সমাজে প্রতিপত্তিও না আছে এমন নয়। কিন্তু তার বাড়ির অন্দর মহল শুনেছি চিক দিয়ে ঢাকা, আজকের দিনেও। আর তার টাকা আসে কোত্থেকে জানো ? পাথরের ব্যবসা থেকে।

তাতে কিছু যায় আসে না বিনীতা। সংসারে অর্থের চেয়ে পবিত্র জিনিস আর কি আছে বল ?

ব্যঙ্গ করছ কর, প্রতিবাদ করব না, আমার আজকের অবস্থা সেই রকমই। কিন্তু যাকে শ্রদ্ধা করবার অবকাশ পাইনি, চেহারা দেখা মাত্র মনের মধ্যে বরং বিপরীত বৃত্তিই জেগেছে, তার অখণ্ড কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিতে বল না।

শোভন কিছুক্ষণ অন্ধকার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

চেহারা মনের রূপ নয় বিনীতা। মানুষের মনকে দেখে চেনা যায় না, জেনে নিতে হয়। আর কর্তৃত্ব জিনিসটা রাজপুত্রেরই সাজে। কোটাল-পুত্রের ওটা ধর্ম নয়।

হেঁয়ালি রাখ শোভন। আমরা মেয়েরা প্র্যাকটিক্যাল জীব, এই সব উড়ো কথায় আমাদের মন ভোলে না। একটা কথার সোজা জবাব দাও। যদি আমরা কোন দিন ছাড়াছাড়ি না হই, যদি আমরা বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখি?

শোভন বিবর্ণমুখে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে যাই বলুক, মনের ভেতরে ভীষণ তোলপাড় চলেছে তার। ভবিষ্যতের কথাই তো ভেবেছে এতদিন, যবনিকা পতনের কাছাকাছি এসে সেই কথাই ভাবতে হয়। না ভেবে কি পারা যায়। কিন্তু অতলস্পর্শী অন্ধকার ছাড়া মনের ভেতর কোন উত্তর খুঁজে পেলনা এই মুহূর্তে। বাস্তব ক্ষেত্রে যার এক কণা ক্ষমতা নেই, সে কি উত্তর দেবে। এমনিতেই কত বাধা। বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে শেষ পর্যন্ত যা করতে হয় তা করলে তাদের উভয় পরিবারই বেঁকে বসবে। বিনীতারা ব্রাহ্মণ। সেদিক থেকেই সে শুধু পেছিয়ে নেই, অর্থের দিক থেকেও যে অনেক—অনেকখানি তফাত রয়েছে! এক্ষুণি এর কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তুমি আজ ভীষণ সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছ বিনীতা, তাই ও কথা বলছ। ঠাণ্ডা মাথায় পরে ভেবে দেখ কথাটা, নিজেরই তখন হাসি পাবে।

ক্ষীণ গলায় কথাটা বলল শোভন। বিনীতা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ভেতরে বাষ্প ফেনিয়ে উঠেছে তার। কানেই তুলল না কথাটা। নিজের খেয়ালেই বলে চলল, চল শোভন, আমরা পালিয়ে যাই। তোমারও কেউ নেই, আমারও না। পালাতে বাধা কি আছে—

শোভন থেমে থেমে বলল, তোমার সবাই আছেন। তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার দিদি। সব কিছুই তোমার আছে। রূপ

গুণ অর্থ ভবিষ্যৎ! তোমার কোটাল পুত্রেরও কিছু নেই তা নয়, ঋণ রয়েছে, কর্তব্য রয়েছে পিছনে জড়ানো, আর সামনে রয়েছে ভয়। বন্ধুত্ব নিয়ে সারা জীবন ভোলেনা, বিনীতা। কিন্তু এখন, এই অনিশ্চিত বর্তমানে তোমাকে বন্ধুত্বের বেশি আর কিছুই তো দিতে পারব না আমি। সামনের দিনগুলো বড় ভয়ঙ্কর—

বেশি চাইনা। বেশির আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই করিনি। কিন্তু যা চেয়েছি সেটুকুর জন্যে বল আমাকে আর কি করতে হবে?

আমাকে সময় দাও বিনীতা, আমাকে কিছুদিন সময় দাও। ভেবে দেখি।

সময়, ভেবে দেখবে? কতদিন সময় পেলে তোমার আরো কিছু দিন হয়?

শোভন অনেক ভেবে বলল, সময় অনিশ্চিত, একবছর দুবছর কি আরও বেশি সময় যদি লাগে? পারবে কি অপেক্ষা করতে?

কাপুরুষ কোথাকার! হাত ছেড়ে দিয়ে বিনীতা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল, সময় কোথায় পাবো, আর কিছু যদি চাইতে ভেবে দেখতাম।

তন্দ্রার ঘোর যেন কেটে গেল শোভনের। ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল, তুমি ঠাট্টা করছিলে এতক্ষণ? চল, এবার ফেরা যাক।

চাপা হাসির সুরে বিনীতা বলল, হ্যাঁ, সেই ভালো। এবার ফেরাই উচিত।

একটু পরে রাস্তার আলোয় এসে শোভন বিনীতার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল। সত্যি মেয়েরা রহস্যময়ী!

এর দিনদুয়েক পরে শোভন কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল। কাউকে না জানিয়ে, একরকম চুপি চুপিই। আর সেই থেকে কোন যোগাযোগ নেই বিনীতার সঙ্গে। যথাকালে একখানা চিঠি অবশ্য পেয়েছিল হলুদ রঙের এবং তার বেশ কিছুকাল পরে বিনীতাদের সরকার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কোন এক জংশন স্টেশনে।

তাঁর মুখেই জানতে পেরেছিল বিনীতার বাবা মারা গেছেন থ্রম্বসিসে। নিজের জীবনের দুর্ঘটনা এত ঘন হয়ে এল কিছুদিনের মধ্যেই যে কারও কথা চিন্তা করবার অবকাশও থাকল না আর। কলকাতার বাসা ভেঙে গেল। শুধু বাসাই নয়, সংসারটাও। শোভন একা ছিটকে পড়ল গড়বেতায়। প্রফেসরস্ মেস এবং কলেজ। আড্ডা এবং লেকচার, আর নিজের পড়াশোনা। একটি সরল রেখায় জীবন চলছিল স্তিমিতভাবে। বিনীতার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। শুধু নিজের হতছিন্ন জীবনটাকে, ছিটকে পড়া পুরুষ ভাগ্যকে ভুলতে পারেনি কোনক্রমেই। একটা বেদনা ছিল কোথায় যেন, পুরনো কাঁটার মত মাঝে মাঝে বুকের কাছটায় ক্ষত বিক্ষত করে দিত। পুরুষরা মেয়েদের মত সব সময় অর্থে ভোলেনা, ব্যথাটা এইখানেই। অবশ্য শোভনের অবস্থাটা খুব যে অর্থকরী তা নয়, একটা মানুষের ভাল ভাবে চলে যায় এই পর্যন্ত। হরিপদ কেরানীর মত ভাগ্যিস সে পালিয়ে এসেছিল, তাই দুদিকই রক্ষা পেয়েছে। একদিনের একটি অপ্রকৃতিস্থ মুহূর্তের উচ্ছ্বাসে বিশ্বাস করে শোভন যে কোন অঘটন ঘটিয়ে বসেনি এই যথেষ্ট। বিয়ের আগে মেয়েরা ওরকম একটু আধটু বলেই থাকে, ভাবাবেগ-প্রবণ হয়েই থাকে। বন্ধ বোতলের মুখ খুললে সোডা একটু উথলে ওঠেই, মনে হয় গ্লাসে ধরবেনা। তারপর বাইরের হাওয়া একটু লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই থিতিয়ে আসে তার ফেনা, মানিয়ে নেয় সে অনায়াসেই। শোভন মনে মনে হেসেছিল। সব মেয়েই এমনি, এমনকি বিনীতার মত মেয়েও সব মেয়ের মতই।

বিছানার ওপর উঠে বসে শোভন একটা সিগারেট ধরাল। হাত-ঘড়িতে প্রায় চারটে বাজে। দুঃস্বপ্নের মত প্রচণ্ড দুপুরটা প্রায় গড়িয়ে এসেছে। কিন্তু বাইরে তাপ কমেনি। আপ্‌কান্ট্রির গরম আলো থাকতে মোছে না।

গঙ্গার ধারটা পাঁচটার পর থেকেই জুড়তে শুরু করে অবশ্য, কিন্তু সমস্ত শহর ঠাণ্ডা হতে হতে সেই সাড়ে-ছটা সাতটা।

পিচকিরি করে আর একবার খসখসের পর্দাগুলো ভিজিয়ে দিতে পারলে আরাম পাওয়া যেত। এই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধের মধ্যে আবছায়া ঘরে পাখার চাপাগুঞ্জনে যে মাদকতা আছে তা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার পক্ষে যথেষ্ট। ঘুমের স্বতন্ত্র করে কোন প্রয়োজন নেই, ঘুম আসেও না।

দরজায় টোকা পড়ল। শ্রীনিবাস এসেছে বোধহয় কর্তব্য সারতে। শোভন খাট থেকে নেমে দরজা খুলে দিতেই এক ঝলক আলো এসে মুখে চোখে বিঁধল। বিনীতা! কি ব্যাপার, ঘুমোও নি নাকি। নিশ্চয় ঘুমোও নি। হাতে আবার ওটা কি? সরবতের গ্লাস মনে হচ্ছে। এত সুখের শরীর আমার নাকি!. মনে হয় ব্যঙ্গ করছ আমাকে।

সরো সরো, চুপচাপ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বিনীতা কথা বলে চলল। ওদিকের একটা জানলাও অন্তত খুলে দাও—এযে রাত দুপুর করে রেখেছ—আমার কেমন ভয় করছে—

কথাটা শেষ করেই হেসে উঠল সশব্দে।

শোভন হাসল না। হাসবার একটা ভঙ্গী করল মাত্র। তারপর এগিয়ে গিয়ে পুবদিকের একটা জানলা সম্পূর্ণ খুলে দিল খসখস গুটিয়ে। ডার্করুমের মধ্যে যেন আলো এসে পড়ল। ক্যামেরার বুকের মধ্যে যেমন আলো এসে পড়ে ছবি আগলায় তেমনি করে। শোভন হঠাৎ অবাক হয়ে গেল দেওয়ালে একটি ছবি দেখে। অপটু হাতে আঁকা একটি মেয়ের ছবি। শরীরের রেখাগুলো খুব শালীন নয়, অতিরঞ্জন রেখায় এবং রঙে স্পষ্ট। অপটু ছবি, কিন্তু অপটু মেয়ের ছবি নয়। দামী ফ্রেমে বাঁধানো, সযত্নে দেওয়ালে টাঙানো। অন্ধকারে শোভন এঘরে ঢুকেছিল। তাই বোধহয় ছবিটা এতক্ষণ

লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এখন জানলার সমস্ত আলো যেন একটা ছবির উপরেই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ছোট্ট টিপয়টার ওপরে ঢাকা দেওয়া পাথরের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বিনীতাও এগিয়ে এল ছবিটার দিকে।

আর্টিস্টের নাম সই নেই কিন্তু ছবির তলায়, বিনীতা বলল, ছবি এঁকেই আর্টিস্ট পালিয়ে গিয়েছিল।

বিনীতার ঠাট্টার খোঁচাটা সহ্য করে হাসতে হাসতে বলল, আর্টিস্টরা ছবির তলায় নাম সই করতে ভুলে যায় তা নয়, নাম সই করার মত ভুল তারা করে না। প্রতিটি রঙের মিক্শ্চার, প্রতিটি রেখার টোনের মধ্যেই তো তার নাম রয়েছে, বলতে গেলে ছবির তলাতেই রয়েছে, আনন্দই তার নাম, আলাদা করে কিছু না। আর ছবি রেখেই আর্টিস্টরা পালায়, ছবি নিয়ে নয়।

স্মিতমুখে তাকিয়ে থাকল এক লহমা বিনীতা। তারপর বলল, বুঝেছি, আর্টিস্টের মন হাঁসের পাখার মত পবিত্র, কোন জলের স্মৃতিই তাকে ভেজায় না। তাকে নিষ্ঠুর বলব না, অকৃতজ্ঞও না। কেমন, এই তো ?

অতটা আশা করি না! তারপর তোমার সমুদয় খবর বল ? সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে একটু শব্দ করে হাসল শোভন।

খবর যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। সমুদয় খবর এই অনার্যা নারীর ভাগ্যে জোটেনি। পানীয়টুকু গলাধকরণ কর, বলছি।

সিগারেটটা একটানে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শোভন তরল গলায় বলল, তুমি আমাকে লোভ ধরিয়ে দিচ্ছ, বিনীতা।

চকিত দৃষ্টিতে একবার শোভনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বিনীতা বিবর্ণ গলায় বলল, লোভ ?

সশব্দে হেসে ফেলে বলল শোভন, ভয় নেই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যুর পথে এগোবো না।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে সামলে নিতে বেশি বিলম্ব হল না বিনীতার। সপ্রতিভ ভঙ্গীতে সে বলল, এযে একে চন্দ্র ছুঁয়ে পক্ষের মত কথা বললে।

শোভন উদাত্ত গলায় হেসে উঠল ঘর কাঁপিয়ে। কিন্তু হাসিটা হঠাৎ থেমেও গেল। হাসি থেমে গেলে আহত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে টিপয়ের ওপর থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে শোভন বিছানার ওপরে ফিরে গিয়ে বসল। পুরনো কথা আজ সারা দুপুর ভেবেছে। মনটা তাই আলগা হয়ে গিয়েছিল। এবার শক্ত হয়ে বসল। সাত বছর আগে ফিরে যাওয়া আর কি কোনক্রমেই সম্ভব!

হতে পারে বিনীতা তার অপ্রাপ্ত বয়সের বন্ধু, যাকে বলে বাল্য-বন্ধু। কিন্তু সে একদা কালের কথা, আজ তার রেশমাত্রও মনে থাকবার কথা নয়। মেয়েরা শেষপর্যন্ত বন্ধু থাকে না, থাকতে পারে না। এক্জিবিশনই তাদের স্বভাবধর্ম। আজকেও তার সুখের সংসারের ছবিটা ভালো করে শোভনকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই ডেকে এনেছে। ভেবেছে, শোভন মনে মনে কেমন ছটফট করে দেখতে হবে। এত স্থূল হয়ে গেছে বিনীতা, বলতে গেলে তার চরিত্রটাই পাল্টে গেছে একেবারে।

আমার চিঠিটা কি পেয়েছিলে শোভন?

বিনীতার প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল এতক্ষণ সে মনে মনে পিছু হাঁটতে শুরু করেছিল।

কোন্ চিঠিটার কথা বলছ?

এই চিঠিতে যে খামের চিঠিটার উল্লেখ করেছিলাম।

না। তাতে কি ছিল?

কিছুই ছিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করল বিনীতা।

শোভন বলল, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। আমার কলেজের ঠিকানা তুমি কোথা থেকে জোগাড় করলে বল দেখি!

সে একটা নাটক বলতে পার। শুনলেও বিশ্বাস করবে না। একটি কাগজের ঠোঙা থেকে। তোমাদের কলেজ ম্যাগাজিনের একটি পাতা ঠোঙা হয়ে আমার ঘরে এসেছিল। কাগজটায় ছবি ছিল বলে কৌতূহলে দেখতে গিয়ে দেখি কলেজ স্টাফের মধ্যে তোমার ফটো। দেখেই চিনেছিলাম। তলায় নাম ছিল, নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। কলেজের নামও পাওয়া গেল, সুতরাং ঠিকানাও গোপন থাকল না। কিন্তু মেদিনীপুরের কাগজ বেনারসে এল কি উপায়ে ভেবে পাই না আমি।

এ নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলত। কারণ, অতি সহজ উপায়েই ওটা এসেছে। বাজে কাগজের চলাচলের তো কোন বাঁধা রাস্তা নেই। ধর, কলেজের কোন ছাত্র এসেছিল বেনারসে বেড়াতে, সঙ্গে এনেছিল কলেজ ম্যাগাজিন। ফিরে গেল যখন সঙ্গে গেল না ম্যাগাজিন। এরূপ উপায়েই মুদীর ঘরে এসে জন্ম নিলেন ঠিকানা-রূপী ঠোঙা, বুঝলে—

বুঝেছি, বুঝতে আর বাকি নেই। তোমাকে আর নাটক না করলেও চলবে।

সরবতের গ্লাসটা শেষ করে আবার টিপয়ের ওপরে নামিয়ে রাখতে রাখতে শোভন বলল, তথাস্তু।

কিছু যদি মনে না করো একটা কথা বলি। বিছানার এক-পাশে বসে পড়ে বিনীতা বলল, তুমি বইয়ের ব্যবসা করবে ?

কেন ? হঠাৎ একথা ?

হঠাৎ নয়। তোমার একদিন স্বপ্ন ছিল চাকরি করবে না। স্বাধীন অথচ ভদ্র ব্যবসা করবে, প্রকাশক হবে। মেদিনীপুরে লেকচারার হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে কলকাতায় বইয়ের দোকান করা বোধহয় ভাল।

স্বপ্ন তো শুধু ঐ একটাই ছিল না। যাক সে কথা। যা পারিনি তা নিয়ে আর কথা তুলে লাভ কি। ব্যবসা করতে গেলে

শুধুমাত্র বুদ্ধিতে যে কুলোয় না, বেশ কিছু পরিমাণে অর্থেরও প্রয়োজন হয়, সেটা তোমার বোধকরি না জানা কথা নয়। আর একথাও তুমি ভাল করেই জান যে আমার পৈতৃক সৌভাগ্য সেরকম নয়—নিজের দৌড় আমার কতদূর সে তো তুমি নিজেই বললে—

ধর, তুমি যদি টাকা পাও।

কী করে, লটারিতে বুঝি। নিস্পৃহ ভঙ্গীতে শোভন বলল।

খুব ক্লান্ত রেখায় হাসল বিনীতা। ব্যাঙ্কে আমার অনেক টাকা আছে। আমার টাকা তো তোমারই টাকা, ব্যাঙ্কে সুদে আসলে পচার চেয়ে যদি—

না—কি! খুব জোরে টেনে টেনে হাসল শোভন। তোমার টাকা আমার টাকা যে একই জিনিস একথা আগে জানতুম না। কিন্তু তোমার ভিক্ষে আমি নিতে যাব কেন বলতে পার? তুমি আমাকে অপমান করতে চাও, তাই বল—

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হল বিনীতার মুখখানা পাণ্ডুর হয়ে গেল। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। শোভন লক্ষ্য করে খুশিই হল। খোঁচাটা লেগেছে তা হলে। বিনীতাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল।

অপমান করতে চাও কর। আগেও করেছ, আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু তার জন্যে এতটা পথ আমাকে ডেকে আনবার তো কোন কারণ ছিল না। এসে অবধি এখানে নিজেকে অনাহুতই মনে হয়েছে। তোমার মা বাড়িতে নেই, না থাকুন। কিন্তু গৃহস্বামী অবধি আমি এসেছি শুনেই—এটা যে প্রকারান্তরে আমাকে অপমানই করা, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আমার হয়েছে।

শোভন! বিনীতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল। তার পাণ্ডুর মুখখানা কখন রক্তাভ হয়ে উঠেছে দেখে শোভন প্রায় চমকে উঠল।

মরা লোককে আর এর মধ্যে টেন না। দোহাই তোমার শোভন। সে তোমার বন্ধু ছিলনা সত্যি, তাবলে শত্রু ছিল এমনও তো নয়। আজ তোমাকে অপমান করেছি, জানিনা, যদি করে থাকি, সে আমিই করেছি, অন্য কাউকে তার জন্যে দায়ী কর না। আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে যাকে জীবিতকালে স্থান দিইনি—আজ তাকে কেন টেনে আনবো আমাদের বোঝাপড়ার মাঝখানে—কেন, কেন—

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাষ্পরুদ্ধ অবস্থায় দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিনীতা। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শোভন বসে রইল স্তব্ধ মুখে। হঠাৎ কি ঘটে গেল বুঝতে তার একটু সময় লাগল।

কিন্তু অতর্কিত একটা সন্দেহ মনে জাগতেই শোভন দরজার কাছে ছুটে গিয়ে ডাকল, বিনীতা, শুনে যাও!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, বিনীতা ফিরে এল না। সামনের বাড়ির কার্নিশে বসে একটা দাঁড়কাক গভীর গলায় ডেকে উঠল বার দুই। শোভন ঘরের মধ্যে ফিরে এসে পায়চারি শুরু করল। মরা মানুষ? সন্তোষের কথাই বলে গেল বিনীতা। সন্তোষ, মানে, সন্তোষবাবু কি মারা গেছেন? কবে মারা গেলেন! নিজেকে হঠাৎ বিমূঢ় মনে হল। সকাল থেকে শুরু করে এই একটু-কাল আগে পর্যন্ত বিনীতা দুঃসংবাদকে বুকে চেপে হাসছিল, অনর্গল কথা বলছিল। মেয়েদের ব্যাপারই আলাদা। নিজের মাথার চুল দুহাতে শক্ত মুঠো করে ধরে আরও বার কয়েক পায়চারি করল শোভন।

নিজেকে নিষ্ঠুর মনে হল শোভনের। একটি মেয়ের এতবড় একটা দুঃখের জায়গায় কি করে সে বারবার ছোবল দিয়েছে। হ্যাঁ, ছোবল ছাড়া এই নির্মমতার অন্য কোন বিশেষণ নেই। আঘাত তো

শুধুই আঘাত, সে স্পষ্টাস্পষ্টি ব্যাপার, সরাসরি এসে পড়ে ব্যথা দেয় আবার সরে যায়। কিন্তু ছোবল, সেও আঘাত নিশ্চয়ই, তবে তলায় থাকে একটি দংশন, বিষ-চোঁয়ানো দংশন। হিংসা নয় শুধু, তার সঙ্গে খলতা মেশানো, শোভন আজ তাই করেছে। বিনীতার রক্তে, বিনীতার মনের মধ্যে পর্যন্ত বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি ধুতি-চাদর ছেড়ে ট্রাউজার্স পরে নিল। তারপর মোজার মধ্যে পা গলাতে গলাতে ভাবল, দোষ তো আমারও সবটা নয়, ব্যাপারটা ঘটে গেল এই পর্যন্ত। প্রকৃত অবস্থা জানলে আমি কি ওর সঙ্গে এই ভাবে কথা বলতে পারতাম! আর সেই ভুল হওয়ার জন্যে দায়ী আমার চোখ নয়, বিনীতার সাজ-পোষাক, বিনীতার ব্যবহার। তাতে একতিল শোকের চিহ্ন দেখিনি, বৈধব্যের একটুখানি ইংগিত। এইটেই বিনীতার আসল চরিত্র। কখন যে সুখী হয়, আর কখন যে আঘাত বুকে করে ঘুরে বেড়ায় মুখ দেখে তা বোঝবার উপায় থাকে না।

রোদ যদিও ছাদের উপর থেকে মুছে যায় নি, তবু বিকেল হয়েছে। পথে পথে ছায়া নেমেছে। এইবার বাইরে বেরুনো যায়। বাইরে বেরিয়ে মনটাকে একটু শান্ত করতে চায় শোভন। আগাগোড়া পরিস্থিতিটা খুঁটিয়ে ভেবে দেখতে হবে একবার। বিনীতার ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত উপসংহার তার মনের মধ্যেও কম বড় আঘাত করেনি। একটু আগে যাকে ঈর্ষা করতে পেরেছিল, এখন সেই তার কাছে সবচেয়ে করুণার পাত্রী।

কিন্তু বেরোতে যাবে এমন সময় বিনীতা আবার ফিরে এল। কোলে বছর আড়াইয়ের একটি ফুটফুটে মেয়ে। কোঁকড়া কোঁকড়া পাতলা চুল, টিকোলো নাক। সামনের একটা দাঁত একটু উঁচু, হাসি হাসি ঠোঁট দুখানার ফাঁকে জেগে থাকে। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বিনীতা এসে ঘরে ঢুকল। শোভন একদৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। হয়ত ভাল

লাগছিল কিংবা বিনীতার মুখের দিকে তাকাবার মত মনের জোর পাচ্ছিল না।

এই আমার রাক্ষুসি, বুঝলে? দুপুর বেলায় তোমাকে ঘরের মধ্যে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। তখন খাচ্ছিলে তাই তোমার কাছে যায় নি। এখন ঘুম থেকে উঠেই তোমাকে দেখবে আব্দার ধরেছে—লেখাকে হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে কেঁদে কেটে—

শোভন অবাক হয়ে বিনীতার মুখের দিকে তাকাল। বিগত ঘটনার কোন চিহ্নই সেখানে ছড়িয়ে নেই। না গলার স্বরে, না মুখের ভাষায়। চোখের পাতা থেকে কানের ইয়ারিং পর্যন্ত যেন হাসছে। বিনীতার স্বভাব কিছুতেই বদলাল না। কখন যে কি নাটক করে তার কিছু ঠিক নেই। রাক্ষুসি, লেখা, এদের কোন উল্লেখ একটু আগে পর্যন্ত শোনেনি। তাদের পরিচয় তবু যেন শোভন সবই জানে এমনি ভাবে কথা বলছে।

কি দেখছ অমন করে, রাক্ষুসির মত তোমারও কি স্বভাব খারাপ হল নাকি—নাও ওকে কোলে নাও। সবকথা বলতে পারে না বটে, তবে মান অভিমানগুলো তোমার চেয়ে কিছু কম আছে মনে কর না।

শোভন যন্ত্র চালিতের মত দুহাত বাড়িয়ে বলল, এসো—

মেয়েটি ফিক করে একটুখানি হেসে ফেলে বিনীতাকে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে শোভনের আমন্ত্রণ নাকচ করে বলল, যাঃ।

ছোটরা ঠিক বুঝতে পারে দেখলে। হাসতে হাসতে শোভন বলল, হ্যাঁ, লেখা না কি নাম বললে, সে কে?

বেশ সহজ ভাবে অন্য প্রসঙ্গ তুলতে পারল দেখে নিজের ওপর খুশি হল শোভন।

লেখা একটি মেয়ে। আমাদের বাড়িতেই থাকে, রাক্ষুসিকে সব সময় দেখা শোনা করবার জন্যে রেখেছি। মেয়েটা বড় দুঃখী। ভদ্র ঘরের। লেখাপড়াও সামান্য কিছু জানে। অবস্থার দুর্বিপাকে

পথে নেমেছে। তিন কুলে কেউ নেই, স্বামী ছিল, কোন দুর্ঘটনায় সম্ভবত মারা গেছে।

ভালো করে পরিচয় না জেনে অপরিচিত কাউকে এভাবে রেখোনা। এটা বাংলা দেশ নয়।

সেজন্যে ভেবোনা। লোক দেখলে অন্তত চিনতে পারি। নিজের কথাও বেশি কিছু বলতে চায় না। না বলুক, আমারও কোন কৌতূহল নেই। এটুকু বুঝেছি মেয়েটি বড় সরল, অন্তত খল নয়। কাশীতে অল্প বয়সের অনেক বিপদ আছে। হয়ত তেমন একটা ভয়ে আমাদের বাড়িতে ছিটকে এসেছিল একদিন। হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল আমার পা জড়িয়ে ধরে। আমি ওকে অভয় দিয়েছি। সেই দিন থেকেই মনে মনে আমি ওর দিদি হয়েছি। ভাগলপুর থেকে মা এসে সব শুনে আপত্তি তুলেছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েটার হয় মাথার ছিট আছে, নয়ত কোন রকম গলদ আছে কোথাও। ওকে বাপু বিদেয় করে দে। যাক, সে অনেক কথা। সে সব বলে তোমার মাথা ধরিয়ে লাভ কি। অনেক তো বকেছি আজ। তা ধরা চুড়ো পরে কোথায় বেরোনো হচ্ছে শুনি?

পুরনো বেনারসের সঙ্গে একটু পরিচয় করে আসি। সাতবছর আগের বেনারস যে আমাকে ক্ষুধিত পাষাণের মতই টানছে।

ওকথা বলো না। বেনারসের নিজের কোন ক্ষুধা নেই, তবে পাষাণ নিশ্চয়ই। আমাদের দেবতারা চিরকালই পাষাণ। কিন্তু তবু দেখ, একবার যে বেনারসকে ভালবেসেছে তাকে এই পাথরেই মাথা খুঁড়ে মরতে হবে। না ভাগলপুর, না মির্জাপুর, কোথাও যদি আমার মন টেঁকে। যে জন্যে মার দুঃখের অন্ত নেই, তাঁর কাছে থাকতে পারি না বলে। বাবা কিন্তু আমাকে ঠিকই বুঝেছিলেন, তাই বেনারসের বাড়িগুলো, সন্তোষের ভাষায়, ন্যাস্টি বাড়িগুলো, আমাকেই দিয়ে গেছেন।

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা এসে পড়ছে বারবার। শোভন বিব্রত বোধ করল। আজকের ব্যবহারটার জন্যে অনুতাপ হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই। আঘাতটা মেনে নিয়েছে বিনীতা, এইটেই তার দিক থেকে লজ্জার ব্যাপার।

বিনীতা, আমার মুখের কোন লাগাম নেই। সব সময় কিছু ভেবে চিন্তে কথা বলি নে। তুমি কিছু মনে কর না, ভুল বুঝ না।

আরে, কি ছেলেমানুষী করছ। কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিনীতা বলল, ক্ষুধিত পাষাণ বলায় তোমার কোন অন্যায় হয়নি। একটু থেমে মুখ টিপে হেসে মন্তব্য করল, তুমি ভুলে গেলেও আমি তো ভুলিনি—

কী ভোল নি ?

তুমি এক সময় কবিতা লিখতে।

ওঃ, এই কথা ! শোভন হাসল হা হা করে, ঢেউ তুলে তুলে। বিনীতাও হাসল সেই সঙ্গে, দেখাদেখি রাক্ষুসিও।

হাসি থামলে শোভন বলল, আমার তখনকার ব্যবহার ক্ষমা করেছ ? আমি সত্যিই জানতাম না যে তোমার—কবে হল ব্যাপারটা, কী অসুখে ?

অসুখে ? কেমন অস্বাভাবিক গলায় হাসল বিনীতা। হ্যাঁ, তা অসুখেও বলতে পারা যায়, তবে লোকে বলে অ্যাক্সিডেন্ট। বছর ঘুরে এল প্রায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, পরে শুনো যদি শুনতে ইচ্ছে যায়, এখন বেরুচ্ছ, বেরোও। তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু, কিছু তো খেয়ে গেলে না।

সরবতই যথেষ্ট। বেলা গিয়ে খেয়েছি। আর নিজগুনে তো খাইনি, তুমি খাইয়েছ, সুতরাং একটু এলাহী কাণ্ড হয়ে গেছে, একটু পদচালনা করে আসি······

আবহাওয়াটা হাল্কা করে দিয়ে শোভন বেরিয়ে গেল।

শোভন বেরিয়ে গেলে বিনীতা ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল।

দোতলার বারান্দার এক কোণে লেখা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বিনীতা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, অ মুখপুড়ী, অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? সব সময় যদি এমন মন খারাপ তাহলে বাপু তোমাকে রাখা আমার পোষাবে না।

লেখা সত্যিই অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টের পায় নি কখন বিনীতা নিচে নেমে এসেছে। ডাক শুনে চমক ভাঙল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যেতে দেরি হল না।

বিনীতা হেসে ফেলে বলল, নে, ঢের হয়েছে, আর ঢঙ্ করতে হবে না। রাক্ষুসিকে নে। আমার এখনো অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

লেখা রাক্ষুসিকে নিয়ে বিনীতার সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে কিন্তু বিনীতার ধমক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আবার।

অত ছটফট করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? শোন, এদিকে আয়, কি হয়েছে তোর!

চট করে একবার চোখের পাশটায় আঁচল বুলিয়ে নিয়ে লেখা বলল, কই কিছু হয়নি তো দিদি। এমনি···ভাবছিলাম—

এমনি ভাবছিলুম! দ্যাখ, তোর কিছু হয়নি-টয়নি বুঝিনা—বলতে না চাও না বললে, কিন্তু মুখের হাসিটি ফুরিয়েছে কি··· এবাড়িতে হাসি নিষেধ নয় বুঝেছ—যখনই পারবে ভাবনাটাবনা-গুলো শিকেয় তুলে রেখে দু-দণ্ড হেসে নেবে। তাতে তোমারও পরমায়ু বাড়বে, তোমার চাকরিরও—যাও।

চুলের নড়া ধরে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বিনীতা ওকে আবার তাড়া লাগাল—যা পালা।

কিন্তু আজ বিনীতার কি হয়েছে, দুচার পায়ের বেশি লেখা এগোতে পারল না। বিনীতা আবার ক্ষেপে গেল, ওকি পালাচ্ছ কোথায়? শুধু রাক্ষুসিকে রাখলেই তোমার খাওয়া জুটবে না— বড্ড ফাঁকিবাজ হয়েছো দেখছি। ওপরে শোভনবাবুর ঘরটা এবেলাও একটু গুছিয়ে রেখ, বুঝেছ? শ্রীনিবাস তো কুঁড়ের বাদশা, ওর কাজকর্মগুলো একটু নজর রেখ···আর হ্যাঁ, ঘরে গিয়ে নিজের অপরূপ মূর্তিখানা একবার দয়া করে আয়নায় দেখ—মাথায় তোমাকে ভগবান আর কিছু তো দেননি ওই গুচ্ছের জঙ্গল ছাড়া, তা ওগুলোকে একটু পরিষ্কার রাখলে, একটু বেঁধেটেঁধে রাখলে, আমরা কৃতার্থ হই বুঝেছ? এবার গোল্লায় যাও—

লেখা গোল্লায় গেল না, ঘরে আয়নার সামনে গিয়েও দাঁড়াল না। একটু আড়ালে গিয়ে অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ল। বিনীতাকে সত্যিই সে ভয় করে, মনে প্রাণে ভক্তিও করে। বিনীতা তাকে যে ভালবাসে, অন্তত ঝিয়ের পর্যায়ে দেখে না, প্রতিদিনকার খুঁটি-নাটি ব্যবহারে তা বেশ বুঝতে পারে লেখা।

জীবনে স্নেহ সে কারো কাছে পায়নি। এখানেই বোধহয় প্রথম তার স্পর্শ পেল। তাই কারণে অকারণে চোখের জল বাগ মানতে চায়না। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরের কাছে যে দরদটুকু সে পাচ্ছে, নিজের লোকের কাছে তার সিকির সিকিও পায়নি কখনও। পেলে তার অবস্থা আজ অন্যরকম হত। এই বিনীতাদি, তার নিজের মায়ের পেটের বোনের মতই সেই সময় আশ্রয় দিয়েছিল, যখন সন্দেহ-সংশয়ে বেনারসের সমস্ত-ভদ্রপরিবারের দরজাই বন্ধ ছিল একটা অসহায় মেয়ের মুখের ওপর। যে সময়ে আর বিলম্ব হলে লেখার পক্ষে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হত না।

রাক্ষুসিকে কোল থেকে নামিয়ে খেলনা দিয়ে বসিয়ে রেখে নিজে অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ল লেখা।

কিছুরই তো অভাব ছিল না তার। বাবা মা যতদিন বেঁচে

ছিলেন তাঁর আদরের সীমা ছিলনা সেই একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে। কিন্তু সে অতি ছোট বেলার কথা। ঝাপসা ঝাপসা স্বপ্নের মত মনে পড়ে। কিন্তু ভাল করে জ্ঞান হবার পর থেকে সংসারের অন্য চেহারা চোখে পড়ল তার। মা-বাবা নেই, আপনার জন চলে গেছেন। কাকাজ্যাঠাদের সে তখন অন্য চেহারা, অন্য মেজাজ। জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে তার যে কত তফাৎ সেটা স্পষ্ট করে বুঝল ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে—যখন তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল। ছাড়িয়ে নেওয়া হল, কারণ তাকে নাকি চোখে চোখে রাখবার প্রয়োজন হয়েছে। বাড়ির অন্য মেয়েদের মত তার নাকি শুধু পড়াশোনায় মন নেই। আর মন নেই যখন তখন এই দুর্দিনের বাজারে কাঁড়ি কাঁড়ি মাইনে গুণবার কোন মানে হয়? পাশ তো করবেই না, উল্টে কোন রকম কেলেঙ্কারী হবার আগেই,—কাকীমারা পরস্পর টিপ্পনী কাটলেন—মুখে রক্ত তুলে পুরুষরা টাকা রোজগার করে আনবে সে কি ধিঙ্গিমেয়ের কেতাবী সখ দাবড়ানোর জন্যে!

লেখা সেদিন অপমানে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল মাত্র, কোন জবাব দেয়নি। নিজের লোকেরাও কত সহজে মিথ্যে কলঙ্ক চাপিয়ে দিতে পারে তা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। লেখাপড়ায় তার সত্যি মন ছিল, মাথাও ছিল। ঘরের কাজ করে বাকি সময়টা সে পড়ার বই নিয়েই বসে থাকত, অন্য কোন দিকে চাইবার কথা মনে আসেনি। বরং তার অন্য বোনেরা যখন মাস্টারের কাছে পড়ত, সিনেমা থিয়েটার দেখত, বিকেলে বেড়াতে বেরোতো, তা নিয়ে পর্যন্ত তার নিজের মনে কোন আক্ষেপ ছিল না। তাদের পড়াশোনার বিঘ্ন হবে বলে তারা একগ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খেত না। লেখাকে বই হাতে করতে দেখলেই তাদের নানা জিনিসের প্রয়োজন হত।

কাকীমারা লেখার ব্যবহারে যথেষ্ট সন্দেহের বিষয় আবিষ্কার

করলেও নিজের মেয়েদের চালচলনে তাঁরা গর্হিত কিছুই দেখতে পেতেন না। শুধু পরশ্রীকাতর প্রতিবেশিণীরা মাঝে মাঝে নানা কথা রটাত।

তারপর চোখের সামনে দিয়ে লেখার বোনেরা কেউ কেউ দু-চারবার হোঁচট খেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করল, কেউ কলেজে ঢুকল, কেউ কেউ বা টাকার অঙ্কে চড়ে শ্বশুরঘর করতে চলে গেল। সমবয়সীরা ধীরে ধীরে নিজের নিজের ঘর-সংসারে গৃহিণী হয়ে বসল। চোখের সামনে থেকে সরে গেল তারা। তারা তবু একরকম ছিল। কিন্তু তারপরে ছোটরা ক্রমে বড় হল। তারা কেউ আজ কলেজে যায়, কেউ কলেজ ছাড়বে ছাড়বে করছে। ভাইদের কারও কারও বিয়ে হয়েছে, কেউ সবে চাকরিতে ঢুকেছে। সংসার ফুলে-ফেঁপে মস্তবড় হয়েছে। আর সংসার যতই বড় হয়েছে, লেখা ততই পিছু হটতে হটতে হেঁসেল আর কলতলার সীমানায় স্থায়ীভাবে এসে পড়েছে। যতই সে অপরিচিত হয়েছে, ততই তার মূল্য কমেছে, সম্মানটুকু শেষ হয়েছে।

সে সব দিন ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার, চোখের জলে ঝাপসা। রাতগুলো ক্লান্তিতে ক্ষুধায় আর দুশ্চিন্তায় পীড়িত, বিনিদ্র। রান্নাঘরের কালিতে আর ধোঁয়ায় লেখার রঙ ময়লা হতে শুরু করেছে, চোখ বসে গেছে যত কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়েছে তত, ক্ষার আর ছাইয়ের নিয়মিত ঘষা লেগে লেগে হাতের আঙুলের নখগুলো ক্ষয়ে গেছে, আঙুলগুলোর শ্রী নষ্ট হয়েছে। দেখলে আর্সোলায় খেয়েছে মনে হয়। রূপ যাচ্ছে, যৌবন যাচ্ছে। কিছুই তো থাকে না, শুধুমাত্র আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকবার সময় কোথায়!

সংসার যত বড় হয়েছে ভ্রূকুটির সংখ্যা তত বেড়েছে। মালিকানা স্বত্ব ছড়িয়ে পড়েছে ছোটবড় চতুর্দিকে। লেখার মুখের কথাও ততই কমেছে। হ্যাঁ কিংবা না জানানোর চেয়ে বেশি কিছু

জানানোর অধিকার বা প্রয়োজন নেই সংসারে তার। ঘাড় কাত করে, ঘাড় নেড়েই দিব্যি তা বোঝান যায়। আর বলতে গেলে সংসারের হাড়িকাঠে সে ঘাড় বাড়িয়েই ছিল।

একটি মেয়ে, একটি রক্তমাংসের শরীরের মেয়ে ; একটি মন, একটি রক্তমাংসের শরীরের মন যে সংসারের খাদের মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং দিনের পর দিন যে তার বয়স বেড়েছে, এবং বাড়ছে একথা সংসারের সবাই অনায়াসে ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু চোখের জল নাকি অবাধ্য, মুখের শাসন সে মানে না। অন্ধকারের চেয়েও ভীষণ ভয়ঙ্কর কুটিল পরিনামী ভবিষ্যতের কথা যখন চিন্তা করত তখন জল আসত দুচোখ ছাপিয়ে। সেই জল গোপন করতেই যেন তার ব্যস্ততার সীমা থাকত না। তাড়াতাড়ি পেঁয়াজ বাঁটতে বসত, নয়ত রান্নাঘরের ধোঁয়ার মধ্যে চলে যেত কোনকাজে হাত দিতে। মোটকথা, বুঝে নিয়েছিল লেখা, এ বাড়িতে হাসাও যেমন অপরাধ, কাঁদাও তেমনি। অন্তত তার ক্ষেত্রে। তার দিনের পরে দিনগুলি এই একই ভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে, রঙ ফুটবে না, ঋতুবদল হবে না। ক্রুটিতে তিরস্কারে গ্লানিতে গঞ্জনায় দিনপঞ্জীর পৃষ্ঠাগুলো একই ভাষায় লেখা। এ সংসার নিজের সুখসৌভাগ্য নিয়ে যেমন চলেছে তেমনি চলবে। প্রত্যেকের দরজায় দাঁড়িয়ে কুশল প্রশ্ন করবে, প্রয়োজনের আয়োজন করবে, উৎসব সাজাবে। কতজন আসবে কতজন যাবে, একান্নবর্তী পরিবারের আসা-যাওয়ার পথের ধারের সিঁড়িটা কেবল সেই পায়ের শব্দে ক্ষয়ে যাবে মাত্র।

কিন্তু জীবনের প্রতিটি বাঁক আমাদের নখদর্পণে নয়। অন্ধকারের ভাষা কি আমরা সবসময়ে পড়তে পারি? মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত ভাবে জীবনের মানে বদলায়, দৃশ্যপট ঘুরে যায় অদৃশ্য হাতের টানে। লেখার জং-ধরা দরজায়ও তেমনি একদিন টোকা পড়ল।

আগন্তুক নতুন, তবে খুব নতুন নয়। তার পরিবর্তন খুবই

আকস্মিক। লেখা প্রথমে বিস্মিত এবং পরে ক্ষুব্ধ হয়েছিল এই অযাচিত অনুরাগে। পরে ক্লান্ত লেখা ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছিল এটাকেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে। একটা পথের আশা—পথ মানেই ভবিষ্যৎ—এই যক্ষপুরী থেকে বেরুবার ভবিষ্যৎ আশা পেলে তা অস্বীকার করবার মত মনের বল তখন আর তার ছিল না। কোন্ ভরসায়ই বা থাকবে! তাছাড়া. কমলের ব্যবহারে যতটা আন্তরিকতা ছিল, সমবেদনা ছিল, লোভের চিহ্ন ছিলনা ততটা প্রথমে। লেখার ব্যথা এবং ব্যর্থতা, লেখার ঐশ্বর্য যদি এ সংসারের কেউ একজন উপলব্ধি করে থাকে তবে সে কমল। কমলই প্রথম এবং শেষ দর্পণ হয়ে জ্বলতে জ্বলতে সামনে এল, যার মধ্যে জীবনে এই প্রথম লেখা নিজের মুখ, নিজের যৌবন দেখতে পেল।

দেখে অবাক হল, ভীত হল, এবং পরিশেষে বাঁচতে ইচ্ছে হল। বাঁচতে ইচ্ছে হলেই মানুষের ভয় হয়। সে ভয় বড় গভীর! অন্তত একটি মেয়ের জীবনে সে ভয় বড় সুন্দর। সঙ্কোচে সাবধানে লেখা ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করল কমলের ভালবাসার আলিঙ্গনের মধ্যে, অবশ্য তখন তার তাই মনে হয়েছিল।

ফাঁকি পুরুষরা তো প্রথম থেকে দেয় না, দেয় শেষ মুহূর্তে এসে। মেয়েদের হয়ত ছলা থাকে প্রথমে। লেখা তাই প্রথমেই সন্দেহ করলেও পরে সত্যি সত্যিই নির্ভর করেছিল, বিশ্বাস করেছিল কমলের ওপরে। কমল এ সংসারের আপন জন কেউ নয়, একটি ভেসে বেড়ানো আত্মীয় ছাড়া। পেইং গেস্টের মত সে থাকে এ বাড়িতে, খায়। খরচা দেয় না বটে, তবে ছেলে পড়ায় দুবেলা। দুপুরে কোন মার্চেন্ট অফিসে নিজের কাজে যায়। কিন্তু এ সংসারে কমলের ভূমিকা যাই হোক, পার্টটা নেহাত ছোট ছিল না। বাড়ির সদর-অন্দর, ছোট-বড় সবাইকে সে মাতিয়ে রাখত। এত কথাও সে বলতে পারত! এত হাসি সে হাসতে পারত এবং

নিজের কথা এত সহজে সে ভুলে যেতে পারত যে, এ বাড়ির কেউই তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারত না। যদি প্রাণ বলি প্রাণ, যদি মজা বলি মজা, যা-হোক একটা কিছু কমলের চরিত্রে এমনভাবে প্রকাশ পেত যে, লেখা পর্যন্ত কত সময় হাতের কাজ থামিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছে তার একটা কথা শোনবার জন্যে। এ হেন কমলের মধ্যে সত্যি সত্যিই ফাঁকি থাকা হয়ত সম্ভব ছিল না। আর তাই লেখা তাকে বিশ্বাস করেছিল এবং বিশ্বাস করে শেষ পর্যন্ত এই তার পরিণতি।

একটি পুরুষ কত সহজে পাল্টে যেতে পারে একথা লেখার চেয়ে আজ বেশি করে কে জানে! ঘর বাঁধবে কোনদিন—ছোট্ট একটা নিচু ডালে কুড়িয়ে আনা খড়কুটো দিয়ে—আশাটা নিতান্ত সামান্য হলেও লেখার অবস্থায় তা ছিল স্বপ্নেরও অতীত। আর সেই কারণেই লেখা জড়িয়ে পড়ল, নিজের মধ্যেই নিজে জড়িয়ে পড়ল বলা যায়। পায়ের তলার মাটি সরাবার এই আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হল তখন কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে আর একবার ভয় পেয়ে গেল লেখা। সে মুখের চেহারাই বদলে গেছে একেবারে। সব সময় যে মানুষ হাসিয়ে বেড়াত, মজা করে ফিরত, সে কি রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কথা বলে কম, সকলের সামনে জোর করে হাসলেও মুখে চোখে ক্লান্তি ফুটে উঠতে বিলম্ব হয় না। বাড়ির সকলেই চিন্তিত হয়ে ভাবলেন কি ব্যাপার! কেউ কেউ তাকে চেঞ্জে যাবার পরামর্শ পর্যন্ত দিলেন।

লেখা এই সময়ে নিজের অবস্থা জানালে কমল চমকাল না। এ তার জানাই ছিল কিন্তু সে পাণ্ডুর হয়ে গেল। ব্যবস্থা এবার একটা কিছু যে করতেই হয়। যে কোন পথ, অন্তত ঘরের বাইরের যে কোন একটা পথ। সেইপথ দিয়েই তারা বেনারসে পৌঁছল এবং সেই পথের মাঝখানেই লেখাকে বসিয়ে কমল আবার স্ব-স্থানে ফিরে গেল ক্লাউনের ভূমিকা সাঙ্গ করে।

এই পর্যন্ত এসে লেখা আর ভাবতে পারল না। মাথাটা টলে গেল। একটা অন্ধকার ঘুরন্ত সিঁড়ির মধ্যে পা-পিছলে পড়ে যেতে যেতে যেন বেঁচে গেল। দেয়াল ধরে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিল। শরীরে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় দিতে লাগল কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই কোথা থেকে রাক্ষুসি চেঁচিয়ে উঠল, বাইরে তল্।

বুকের ভেতরটা একটা আশ্চর্য খুশির ঝংকারে বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মনে হল, ছোট একতাল মাংসের পিণ্ড একটি ফুটফুটে মুখ নিয়ে ভেসে উঠেছে তার চৈতন্যের অপর পারে। আর সেখান থেকে চেঁচিয়ে তাকে ডাকছে। শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইছে কানের পাশ দিয়ে। চিৎকারটা স্পষ্ট করে কিছু শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু সমস্ত সত্তা দিয়ে যেন বোঝা যাচ্ছে। মা, নিশ্চয়ই তাকে মা বলে ডাকছে। বাঁচাতে হবে ঐ সুন্দর মুখকে, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলে চলবে না।

বেনারস শহরটা তুষ্মন্তের অঙ্গুরীর মত সেই এক এবং অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। মাঝে হারিয়ে গিয়েছিল বটে, হারানোর কোন চিহ্নই তার গায়ে ছাপ রেখে যায় নি। আর্যাবর্তের হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন এই বারানসী তার পবিত্র পাথরের বেদীর উপরে বসেই সূর্য প্রণাম করতে করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এল। গোটা ভারতের প্রাণকেন্দ্র ছিল একদিন এই নগরী। পাটলীপুত্র মগধ কি দেহলির রাজঐশ্বর্য তার দৈবী ঐশ্বর্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি এতটুকু। শিল্প, শাস্ত্র, সাহিত্য—সভ্যতার এই ত্রিমুখের সঙ্গে ধর্মের যোগ হওয়ায় বেনারস চতুর্মুখ, সেই আদিকাল থেকেই।

বিজ্ঞান এসে দেশের জীবনধারার অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে সত্যি। কালের চুনকামও পড়েছে নগরের দেওয়ালে দেওয়ালে। বেনারসও হয়ত তা থেকে বাদ যায় নি, কিন্তু সে সামান্যই। হয়ত তুটো সিনেমা হল দাঁড়িয়েছে অর্ধনগ্ন পোস্টার বুকে নিয়ে, হয়ত নিওনবাতির সুর্মা চোখে নিয়ে দাঁড়িয়েছে এক আধটা সান্ধ্যরূপসী কাফে বা কফি হাউস। বিলাতি কেতায় হোটেল গজিয়েছে উল্লেখযোগ্য একটি। দূরে দূরে ফাঁকা জায়গা ভরিয়ে তুলেছে হালফেশানের বাড়িগুলি। রেডিও এসে গেছে ঘরে ঘরে, চায়ের হোটেলে নিয়মিত বিষ ঢালছে দৈনিক পত্রিকা। রাজনীতি ধরে ফেলেছে তার একটা হাত, ইউনিভার্সিটি হরফ বদলেছে অনেকটা, সুইমিংপুল বসেছে তার নিকেতনের মধ্যে। কিন্তু তারও গোড়ায় রয়েছে তার দেবচরিত্র, তার বিশাল কারুকার্যখচিত মন্দির।

বেনারস মানে এখনও অর্ধেক, অর্ধেক কেন বারআনাই চুনার।

চুনার মানে চুনারের পাথর। তার বাড়ি, তার মন্দির, তার ঘাট রাস্তা, সব চুনারের গেরুয়াভ পাথরের সংমিশ্রণে তৈরি। এখনও সেখান থেকেই কাঠ আসে জ্বালানির, পাথর আসে শিল্প সামগ্রীর জন্য।

এখনও তার উঁচুনিচু রাস্তাছুটো বেয়ে ঘোড়ার খুর বাজে বারমাস। পাথুরে চেহারার ঊর্ধ্বগ্রীব উট চলে ঘণ্টা বাজিয়ে, বাদশাহী চালে হাতী বেরোয় ফাঁকা রাস্তায়। টাঙ্গায়-এক্কায় সরগরম তার পথ প্রান্তর। রাজদরবাজায় হয়ত বাইজীদের কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কমে এসেছে লাক্ষ্ণৌ-ই কাজ। ঘটা করে পান্সী ভাসে না অসি-বরুণার জলে। গহেরাবাজ ঘোড়ার পায়ে হয়ত বাত ধরেছে। ধুলো জমেছে আরও অনেক বিলাস ব্যসন শৌখিনতার উপরে। ঝালর দেওয়া পাল্কী গেছে থেমে, ঝাড়বাতির যুগের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু পৌরাণিক গন্ধটা যাবে কোথায়। বেনারসের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেই শোভনের নাকে আসে সেই গন্ধ। এর প্রতিটি পাথর ইঁট, কারুকার্য, মন্দিরের ভিড়, শীর্ণ দীর্ঘ শিরাবহুল হাতের মত গলি, তাকে যেন চারদিক থেকে টানতে থাকে। অম্বুরি তামাকের গন্ধের মত, তবলার বিলম্বিত মিঠে বোলের মত, কেমন একটা ঝিমঝিম তন্দ্রাস্থ ভাব যেন জড়িয়ে ধরে তার সমস্ত চৈতন্যকে পর্দায় পর্দায়।

এ এক ধরণের অস্বাভাবিকতা হয়ত। সব মানুষের রক্তে এর বীজ নেই। আকাশের টক টক গন্ধের মত এই অনুভূতিও নিশ্চয়ই হাস্যকর, খাপছাড়া। কিন্তু তা বললে তো শোভনের অর্ধেক জীবনটাই তাই এবং বাকি অর্ধেক জীবনটাও যে তা নয় এমন কোন প্রমাণও হাতে নেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মাথায় খানিকটা উত্তাপ নিয়েই। সেই বাষ্পেই বোধকরি অনেকটা রাস্তা এদিক সেদিকে ঘুরে

বেড়াল। বাসে করে স্টেশনে গেল একবার, স্টেশন থেকে ফিরল। চকের মধ্যে খানিকটা সময় ঘুরপাক খেল, বাঁশ ফাটকার রাস্তায় আলো জ্বালা শো-কেস দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল। ঘাটের দিকে গেল না। বোধহয় ইচ্ছে করেই গেল না। টাঙা ভাড়া নিয়ে বেনিয়া পার্ক, রায়বাগ হয়ে বরুণা পর্যন্ত গেল, তারপর আবার ফিরল। কতবার সিগারেট ধরাল, কতবার ফেলে দিল অর্ধদগ্ধ অবস্থায়।

মোটকথা, ঘণ্টা দুই আড়াই যে ভাবে ছটফট করে সে ঘুরে বেড়াল, তা কোন ক্যামেরায় ধরা পড়লে নিতান্ত লজ্জার সামগ্রী হত, তার নিজের কাছেই। টুকরো টুকরো চিন্তা, কাটা কাটা সিদ্ধান্ত তাকে প্রায় তাড়া করে ফিরল সারা রাস্তা। বিনীতাকে দেখার পর থেকে, বিনীতার দুরবস্থার ইতিহাস জানবার পর থেকে তার মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বিনীতার দেহের প্রতিটি রেখা, শাড়ির টান, মুখের ভঙ্গি, ঈষৎ ভাঙা ভাঙা গলার স্বর তাকে যে কি অকথ্য যন্ত্রণা দেয় এবং কেন যে দেয় সে রহস্য তার কাছে স্পষ্ট নয়। এই দুর্বোধ্য আকর্ষণ যে সবটাই সৌন্দর্যের আকর্ষণ নয়, লুণ্ঠনোন্মাদনা নয়, তা অবশ্য সত্যি। এর সঙ্গে মানসিক জয় পরাজয়ের একটা মিশ্র আক্ষেপানুরাগ মেশানো রয়েছে—যা পুরোপুরি মনোবিজ্ঞানের মধ্যেও পড়ে না, আবার দেহ-বিজ্ঞানেও পুরো স্বীকৃতি পায় না। দুটি আত্মার মধ্যে যে অতিচেতন প্রলয়ী সম্পর্ক আছে, এ বুঝি তাই। রক্তে শুধু এর সুর ধরা পড়ে, স্পর্শ করে, আর কোথাও নয়।

ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে শোভন যখন লক্ষ্মীনারায়ণ রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াল, রাত তখন আটটা বেজে গেছে। বাড়ির কথাই তখনও মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে রয়েছে। সন্ধে বেলার কাকের বাসার মত, অস্পষ্ট কতকগুলি কথাবার্তা, মুখ, মন্তব্য বাইরের বিচ্ছিন্ন ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে মিশে মগজের মধ্যে কোলাহল করে বেড়াচ্ছে।

যন্ত্র চালিতের মত হেঁটে যাচ্ছিল শোভন। এমন সময় পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকল।

আরে, আমাদের এল্ডার ব্রাদার যে। একেবারে জেণ্টেলম্যান সেজে এদিকে কোথায় এতকাল পরে—ও মশাই, কি নাম, হ্যাঁ—শোভনবাবু, হনহনিয়ে চললেন কোথায়?

কথাগুলো কানে গিয়েছিল প্রথমেই কিন্তু ভাবতে পারেনি চট করে যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি সে নিজেই হবে। নিজের নাম শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে যাকে সে দেখতে পেল তাকে জীবনে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না। প্রকাণ্ড ব্যাসের একটি ভুঁড়ির মালিক সেই লোকটি। পরনে গেরুয়া সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে বিরাট বালিশের খোলের মত একটা সাদা ফতুয়া। মাথায় বড় বড় বাবড়ি চুল। মৌচাকের মত জমজমাট কালো চাপ দাড়িতে মুখখানাকে প্রায় দেড়গুণ বড় দেখাচ্ছে। সব মিলিয়ে একটি বিস্ময়ের মত। মুখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ নিয়ে লোকটি শোভনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। শব্দ অনুধাবন করে শোভন, একটু বিলম্বে হলেও, বুঝতে পারল সেটি তার সৌজন্যের সশব্দ হাসি।

আমাকে চিনতে পারলেন না এল্ডার ব্রাদার?

শোভন গম্ভীর স্বরে বলল, না। চিনতে তো পারিই নি, চেনা চেনাও লাগছে না।

লোকটি এমন কথাতেও দমে গেল বলে মনে হল না। একগাল হাসল, পরিতৃপ্তির হাসি। বিস্ফারিত মুখ-গহ্বরটিকে মনে হল একটি বিরাট পানের ডিবেয় কেউ একসার দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, ঘন বাদামী রঙের দাঁত, পানরসে স্থায়ী শ্যাওলা ধরা।

নিচের ঠোঁটটাকে বঙ্কিম ভঙ্গীতে একটু প্রসারিত করে দিয়ে পতনোন্মুখ পানরসকে অতি কৌশলে সংযত করে লোকটি আস্তে আস্তে বলল, তা বাড়িয়ে বলেননি ব্রাদার, কেউই চিনতে পারে না প্রথমটায়…তারপর নাম বললে হেঁ হেঁ…নিজেই চিনতে পারিনা

মশাই অনেক সময়—নিজের রসিকতায় নিজেই খানিকটা হেসে নি গড়িয়ে গড়িয়ে। তারপর আবাব কথা বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার, আমি একটু বাজে কথা বলি···আমার নাম ফটোগ্রাফার মুরলীধর—এই নামেই চেনে সকলে, আপনার জন্যে পুরো নাম মুরলীধর শিকদার। ধর্মশালায় আলাপ হয়েছিল সাত বছর আগে, স্যার মনে করে দেখুন—

নাম শুনেই চিনতে পেরেছিল শোভন কিন্তু চেহারায় এবং সাজ পোষাকে ঠিক যেন খাপ খাচ্ছিল না। একটি রোগা ডিগডিগে দাড়িগোঁফ কামানো বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের চেহারা মনে পড়ে মুরলীধর নামের পূর্বস্মৃতি হিসাবে। এখন তার সঙ্গে কিছু মিল নেই।

মুখে চোখে একটা চোখা ভাব ছিল তখন, চর্বির একটা পোঁচও ছিলনা শরীরে কোথাও। জামা-কাপড়-জুতোয় একটা মলিন আভা। প্রথম দিন দেখে একটা মূর্তিমান ক্ষুধা বলে মনে হয়েছিল। শুধু বিসদৃশ মনে হয়েছিল সেদিন তার কাঁধে ঝোলান চামড়ার খাপে ভরা ক্যামেরাটা দেখে। বলতে কি, খাপছাড়াই লেগেছিল। সন্দেহ হওয়া বিচিত্র ছিলনা চোরাই মাল বলে।

সেদিনও পিছন থেকেই ডেকেছিল মুরলীধর। তবে এমন ভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় নয়, ধর্মশালার নিরিবিলি উঠোনে! আর সম্বোধনটা ছিল এল্ডার ব্রাদার নয়, শুধু 'স্যার শুনছেন'।

তার সেদিনকার আবেদন ছিল তার ক্যামেরাটির পরিবর্তে কয়েকটি টাকা। তুদিন সে প্রায় অনাহারে রয়েছে। মোটকথা, ভিক্ষে চায়নি মুরলীধর, নিজের জিনিস নামমাত্র মূল্যে বেচতে চেয়েছিল। কিন্তু চেয়েছিল প্রায় ভিক্ষে চাওয়ার গলায়, তেমনি ফিসফিস করে, স-সঙ্কোচে।

শোভনের তখনকার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। দিদিমা মারা গেছেন কয়েকদিন আগে। মনটা স্বভাবতই কোমল! ধর্ম-

শালার একটা ঘর নিয়ে সে তখন থাকে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ঘরে ফিরে রামায়ণ মহাভারত নিয়ে বসে কিন্তু দু-পাতার বেশি বোধ করি এগোয় না। এ অবস্থায়ও লোকটার চরিত্র তাকে আকৃষ্ট করেছিল। সব কিছু শোনবার জন্য সে ঘরে নিয়ে গেল মুরলীধরকে।

লোকটার ছবির নেশা, ফটোগ্রাফির। অবস্থাও মোটামুটি রকমের সচ্ছল ছিল, বিয়েও করেছিল বছর দুই আগে। কিন্তু সে বিবাহ সুখের হয়নি। স্ত্রীর ব্যবহারে, নীতিবিগর্হিত ব্যবহারে, সে একবস্ত্রে ঘর ছেড়ে এসেছে—সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু এই নিত্য সঙ্গীটিকে ছাড়তে পারেনি এতদিন। নানা ঘাটের জল খেতে খেতে বেনারসে এসে পৌঁছেচে, হাতে একটি পয়সা নেই। শরীরটাও দুর্বল। কাজ করতে চেয়েছে ছবির দোকানে দোকানে ধর্ণা দিয়ে। কারণ, ক্যামেরার কিছু খুঁটিনাটি সে হাতে কলমে শিখেছে, অন্য বিদ্যে জানা নেই। কিন্তু নতুন লোক, বিশ্বাস করে কেউ কাজ দেয় নি।

কথাবার্তা কয়ে শোভনের ভাল লেগেছিল। ক্যামেরা নেয়নি, তবে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল অমনি। পরিমাণটা অবশ্য নেহাত কম নয়, গোটাকুড়ি টাকা।

মুরলীধর ইতস্তত করলে বলেছিল, ধার দিলাম। যদি কখনও পারেন শোধ দেবেন। এবং তারপর আর কখনই দেখা হয়নি। কিন্তু সেই একদিনের পরিচয় আজও মনের মধ্য থেকে মুছে যায় নি। মুরলীধরও ভোলেনি।

শোভন বলল, অত করে বলতে হবে না, চিনতে পেরেছি। তবে আপনার চেহারা আপদমস্তক পাল্টে গেছে বলে প্রথমটা···

নিজের শরীরের দিকে একবার সপ্রশংসভাবে দৃষ্টিপাত করে মুরলীধর বলল, তা আপনাদের কৃপায় চেহারায় একটু জৌলুষ দিয়েছে বলতে হবে। প্রথমটায় কেউই চিনতে পারে না। আপনার সঙ্গে তো স্যার একদিনের মাত্র পরিচয়, যার সঙ্গে দু-বছর একঘরে কাটালুম···

সেই প্রথম পক্ষই কিনা···কথাটা বলে ফেলেই মুরলীধর লজ্জায় জিভ কেটে থেমে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থামল না। সপ্রতিভ ভঙ্গীতে শুরু করল আবার, তা আপনার কাছে বলায় আমার অপরাধ নেই, লজ্জারও কিছু নেই। আপনি আমার জীবনদাতা, আমার যা কিছু উন্নতি সে আপনারই কৃপায়···সেই জন্যে কতদিন আমি যে আপনাকে খুঁজেছি···কিন্তু মশাই গুণীজন কর্পূরের মতই, কোথায় উপে যায় কখন তার ঠিক আছে! আসুন আসুন, দোকানে বসে একটু জিরিয়ে যান। ঐ যে নিকটেই আমার দোকান।

দোকানটা শোভন এই প্রথম দেখল এমন নয়। বেনারসে যতবার এসেছে দেখেছে, তবে এমনটি দেখেনি অবশ্যই। এত চাকচিক্য ছিল না তখন। সমস্ত নিসর্গ-সৌন্দর্যের সঙ্কলনরূপী একটি বিচিত্র রঙ-জ্বলে-যাওয়া সিনের সামনে যাত্রার সিংহাসনের মত একটি হাতল সর্বস্ব চেয়ার বসান থাকত সব সময়। একপাশে গুটিয়ে রাখা হত একটি আধময়লা ব্লু-স্ক্রীন, যা দেখে বোঝা যেত এটি স্টুডিও, এখানে দিবারাত্র ফটো তোলা হয়। পাশের কাঠের পার্টিশান দেওয়া ঘরখানার মধ্যে নজর চলত না, তবে সে ঘর থেকে মাঝে মাঝেই একজন পক্ককেশ অবাঙালী বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে রাস্তায় পায়চারি করত। সেই দোকানের এখন শুধু যে চরিত্র বদল হয়েছে তাই নয়, তার সুবর্ণযুগ চলছে বলতে হবে।

সুন্দর অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি কাঠের কাউন্টারের দু-পাশে দুটি সুসজ্জিত শো-কেস ভর্তি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ভেলভেটের গদির ওপরে সাজান। ফিকে নীল পাইপ লাইটের আলোয় ঝকমক করছে সেগুলি। দেয়ালে বিভিন্ন মেয়ে পুরুষের বিভিন্ন ভঙ্গীর ফটোগ্রাফ। দোকানের কপালের ওপরে মস্তবড় সাইন বোর্ড, তাতে হিন্দী বাংলা এবং ইংরেজীতে তিন সার লেখা: রুক্মিণী মুরলীধর এণ্ড সন্স।

শোভন অবাক হয়ে বলল, এই দোকানের আপনি অংশীদার নাকি ?

বিনয়ের হাসিতে মুরলীধরের মুখের চর্বি যেন গলে গেল। হেঁ হেঁ, একমাত্র মালিকও ভাবতে পারেন। আবার তিনভাগের একভাগ যদি বলেন তাতেও...

তার মানে ?

তার মানেটা ভেতরে নিয়ে গিয়ে গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে মালাই খাইয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলল মুরলীধর। শোভনের কোন তাড়া ছিল না। তাছাড়া লোকটির সৌভাগ্যের ইতিহাসে না হোক, অদ্ভুত কথা বলবার কায়দায় বেশ আকৃষ্ট হয়ে গেল শোভন। বসে বসে শুনল তার ভাগ্য পরিবর্তনের বিচিত্র কাহিনী। একেই হয়ত বলে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোন। মূল মালিক বজরঙ্গ পরসাদ অর্থাৎ ব্রজরঙ্গ প্রসাদের অধীনে সামান্য মাইনের কর্মচারী হয়ে ঢুকে বিশ্বাস ও কর্মদক্ষতা দেখিয়ে ক্রমে তার পনের বছরের মেয়ে রুক্মিণীকে বিয়ে করে বুড়ো মারা যাবার মুখে মুখেই মালিক হয়ে বসেছিল মুরলীধর। সহজ ভাবে অবশ্যই ঘটেনি ঘটনাগুলো। অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক কথান্তর, অনেক টানাপোড়েন চলেছে সংস্কার ভাঙতে।

কিন্তু যার বুদ্ধি এবং দক্ষতায় দোকান হু-হু করে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তাকে শেষ পর্যন্ত নাকচ করতে পারেনি বৃদ্ধ ব্রজরঙ্গ প্রসাদ। ব্রজরঙ্গ শরিকানী মামলায় ভিটে মাটি হারিয়ে দেশ ছাড়া হয়েছিল প্রায় মাঝ বয়েস থেকে। বেনারসে এসে পীতাম্বরপুরার একটেরে বাসা নিয়েছিল। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে স্বজন পরিজন কারও সঙ্গেই আর কোন যোগাযোগ ছিল না। সেই কারণেই বোধহয় একজন ভিন দেশী যুবককেও মেনে নিতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত। মেয়ের জন্য চিন্তা ছিল না, কোথাও না কোথাও বিয়েহয়ে যেত অনায়াসে। ভাল মন্দের প্রশ্ন আসে না।

কিন্তু এই দোকানটি ছিল মেয়ের চেয়েও বেশি আদরের। নিজের হাতে গড়ে তুলেছে সে একে। দুঃসময়ে দানা-পানি এসেছে এরই কল্যাণে। তাই দোকানকে এবং মেয়েকে একসঙ্গে কোন বিশ্বাসী লোকের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে চাইছিল নিজের আয়ু ফুরবার আগে আগেই। কিন্তু একঢিলে দুইপাখি মারবার মত ঢিল মুরলীধর ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায়নি হাতের কাছে।

আর মুরলীধরের মত চরিত্রের লোকের কাছে বিবাহ ব্যাপারটা অতি নগণ্য ব্যাপার, যদি শখের ইজারা হাতে পেয়ে যায় একেবারে। ক্যামেরার শখ তার ছেলে বেলাকার শখ। এখন সে নিজে হাতে প্রিন্টিং ডেভেলপিং থেকে শুরু করে ছবি এনলার্জিং পর্যন্ত করে। এক কথায় ছবির রান্নায় সে রীতিমত হাত পাকিয়ে ফেলেছে। ক্যামেরার চোখের সঙ্গে তার চোখের মিল হয়েছে। প্রয়োজনীয় অ্যাসিডপত্র কিনে এনে বিভিন্ন ফরমুলা অনুযায়ী নিজেই সলিউশন তৈরি করে, আবার নিজেই ছবি মাউন্টিং-এর আগে চোখে আইগ্লাস সেঁটে তুলি হাতে রিটাচ দিতে বসে যায়। এক কথায় করিতকর্মা লোক, খাটতে পারে অসম্ভব। উৎসাহ আছে, কাজ শিখেছে নানা জায়গা থেকে।

মুরলীধর এখন শুধু যে দু-পয়সা করেছে তা নয়, বেনারসের এই পূর্বাঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছে। মুখে চর্বিগলা হাসি আর এন্ডার ব্রাদার ছাড়া কথা নেই। প্রয়োজন মাফিক আজ্ঞে-হুজুরও করে, তবে জোড়হাত করে নয়। ঝানু লোক। ব্যবসাটা ঠিকই আঁকড়েছে। রুক্মিণী পর্যন্ত সাইনবোর্ডের ভাষা ঠিকই আছে, তবে এণ্ড সন্স কথাটা এখনও ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী। হয়ত ওটাও মুরলীধরের ত্রিভঙ্গ বিনয় মাত্র।

একে মেয়েছেলে, তায় অবাঙালী, বুঝলেন না···ওদের খুশি রাখতে না পারলে নিশ্চিন্তি নেই। নিজের চাপ দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে মুরলীধর বলছিল—যাক আসল কথা শুনুন

তাহলে সেদিনকার। ঐ যে মোড়ের মাথার ধরমশালাটা চেনেন তো···ওখানে সন্ধে বেলা দাবার আসর বসে, আমিও মধ্যে-মধ্যে সময় পেলেই যাই···বেশ জমে মশাই। সেদিন সন্ধেবেলায় সবে ধরমশালার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি, আর যাবে কোথায় একেবারে সামনাসামনি—

মুরলীধর ঠোঁটের ওপর দাঁতের প্রেসার রেখে চোখ দুটো বন্ধ করল। শোভন বলল, কে একেবারে সামনাসামনি ?

ওয়াইফ্ মশাই। আমার প্রথম পক্ষের ওয়াইফ্—খুব মজা হয়েছে এইরকম ভঙ্গীতে হাসল মুরলীধর, চোখ দুটো বড় বড় করে। তেথ করতে এসেছে ডাইনীটা। মুখে কি আসছে কি বলছি, ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন স্যার। দেখলাম ডাইনীর চেহারাটাও খাসা হয়েছে। হবেই তো, চোখের কোলে কালি, শরীরটা গেছে বেঁকে—বিষ দাঁত পড়ে গেলে কালনাগিনীর যে দশা হয় আর কি ! আমাকে চিনতে পারেনি প্রথমটায়। সামনাসামনি পড়ে যেতে ঘোমটা টেনে পাশ কাটাচ্ছিল। আমি পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ অত লজ্জা কেন রাধে, পরপুরুষ দেখলে তো তুমি অমন ঘোমটা দিতে না আগে—আজ্ঞে, বলা উচিত, আমার ওয়াইফের নাম রাধিকে। তারপর সে বুঝলেন কিনা, ঠিক জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। ভীষণ চমকে গিয়ে এক লহমা তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপরে একেবারে ডাইভ খেয়ে আমার পায়ের উপর। উফ্, সেকি কান্না। লোক জড়ো করে ফেলে আর কি ! আমিও ফটোগ্রাফার মুরলীধর, সিচুয়েশন বুঝি, মেয়েছেলের কান্নায় অত সহজে ভিজি না। নিয়ে গেলাম একধারে টেনে, যা বলবার হয় আড়ালে বল।

ওস্তাদ গল্প বলিয়ের মত মুরলীধর কথার মাঝখানে কিছুক্ষণের ছেদ টেনে আবার শুরু করল, অনেক কথাই বলল। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—সে আর হয় না, আমি এখন বিবাগী হয়ে গেছি,

বাংলাদেশে আর ফিরব না। দ্বারা পুত্র, পরিবার, তুমি কার কে তোমার—আমি ওসবের মধ্যে নেই। পাপ আকর্ষণের মধ্যে আমাকে আর টেন না। তখন সেই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ওয়াইফটা কি বললে জানেন? আমিও তাহলে যাব না। এখানেই তোমার সঙ্গে বাস করব। কি আব্দার শুন্নুন একবার! তখন কাজে কাজেই কড়া হতে হল। ধমক দিয়ে বললাম, আমাকে আর সুড়সুড়ি দিও না রাধু, কোন ফল হবে না। যাবার আগে বরং ঠিকানা রেখে যেতে পার, বিবেচনা করে দেখব কি করতে পারি—

শোভন হাতঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় নটা বাজে। আর দেরি করা যায় না। মুরলীধর তা লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়াল। বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার? তাহলে আজ উঠুন, আবার আসবেন কিন্তু···কুড়িটা টাকা ফেরত দিয়ে আর আপনাকে অপমান করলাম না, এ দোকান ধর্মত আপনারই। যখন দরকার হবে আসবেন, সঙ্কোচ করবেন না কিন্তু···আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু আপনি আমার বন্ধুর মত···কথাবার্তায় কোন অপরাধ নেবেন না।

আপনার স্ত্রীর কথাটা শেষ করলেন না—স্বাভাবিক ভদ্রতা-বোধে শোভন জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

ওঃ, হ্যাঁ, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে—ঠিকানাও রেখে গিয়েছিল ঠিকই। আমি মাসান্তে কিছু টাকাও পাঠিয়েছিলাম কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার, ডাক ফেরত এসেছে, টাকা সে নেয়নি···তাই মাঝে মাঝে ভাবি—

মাঝে মাঝে কি এত ভাবো ফটোগ্রাফার!

শো-কেসের ওপর একটা দীর্ঘ ছায়া পড়ল। মুরলীধর প্রায় কুর্নিশ করে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেল: আসুন স্যার আসুন, ভেতরে আসুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন?

না ভেতরে আর যাব না, আমার প্যাকেট রেখে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যে—পর্দা ঠেলে দোকানের চোর কুঠুরির মধ্যে ঢুকে গেল মুরলীধর এবং গেল কি বেরিয়ে এল ব্রাউন পেপারে মোড়া একটি বড় প্যাকেট হাতে করে—এই নিন স্যার, সন্ধে বেলায়ই রেখে গেছেন।

শো-কেসের আড়াল পড়েছিল বলে ভাল করে দেখতে পায়নি এতক্ষণ শোভন। এইবার সরে আসতেই দেখতে পেল, ঢিলে পায়-জামা আর আলখেল্লা প্রমাণ সিল্কের পাঞ্জাবি পরা লোকটি হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল। হাত বাড়াতেই নজরে পড়ল দু-বগলে দুটো ক্রাচ্ এবং হাত দুটো বেশ বলিষ্ঠ। রঙ্‌টা টকটকে ফর্সা, রঙের আভা যেন চামড়া ফেটে বেরুচ্ছে। চাপাঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাক, দৃঢ় চিবুক, উঁচু কপাল, চোখ দুটে অত্যন্ত পরিমাণে অন্যমনস্ক, পুরু লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা দিয়েও একাগ্র করে বাঁধা যায়নি। বরং ভেড়ার লোমের মত রোল করা একমাথা ঝাঁকড়া চুল আরও উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে চেহারাটাকে। বয়সটা ঠিক ঠাহর হয় না, পঁয়ত্রিশ থেকে যে কোনো উর্ধ্ব অঙ্কে পৌঁছুতে পারে। দাঁত বার করে সুশ্রী হাসল লোকটি। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতগুলোর রাসায়নিক দুর্দশা চোখে পড়ল, পীতল রঙের ছোপ ধরেছে! হাসিটা অবশ্য কাউকে লক্ষ্য করে নয়, কথার শেষে ও কথার আরম্ভে অমনি হাসা বোধহয় অভ্যেস। কাঁধে ঝোলানো কাজ করা কাপড়ের থলিতে প্যাকেটটা ভরে নিয়ে বলল, গুডনাইট, ফটোগ্রাফার, আজ চললাম।

মুসলমানী কায়দায় সেলাম করল মুরলীধর: ইয়েস স্যার, গুডনাইট স্যার।

ক্রাচের শব্দ এগিয়ে গেল বাঁশফাটকার পথ ধরে। দীর্ঘ ছায়াটা এক এক ঝাঁকানীতে এগিয়ে যেতে লাগল অনেকটা করে পথ।

ড্রাঙ্কার্ড! দাঁতে দাঁত চেপে মুরলীধর উচ্চারণ করল।

মদ খান নাকি ভদ্রলোক? শোভন শুধোয়।

মদখান মানে! মদে চুর হয়ে থাকেন সব সময়। পাকস্থলী

নয় তো, সাক্ষাৎ অগস্ত মুনির কলজে, সমুদ্র পর্যন্ত হজম করে দিতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু এই যে এসেছিল টের পেলেন কিছু, টের পেলেন যে একটা মদের পিপে এসে দাঁড়িয়েছিল। কি নিয়ে গেল তাও কি বুঝলেন? না বলে দিলে কিচ্ছুটি টের পাবেন না। যদি বলেছি লিভার পচে যাবে যে! অমনি একমুখ হেসে বলবে: ফটোগ্রাফার, ড্রিঙ্কিং ইজ দি বেস্ট এক্সারসাইজ! মনে রেখ কথাটা। তা আমার বাপু কি দরকার, তোমার টাকা আছে তুমি ঢকঢক করেই খাও আর ধোঁয়া করেই উড়িয়ে দাও, আমার কি! তবে কিনা দুঃখ হয় বলেই বলি।

অবস্থা খুবই ভাল বোধহয় ভদ্রলোকের? তা আপনার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হল কি করে?

ভাল বললে কমিয়ে বলাই হবে এল্ডার ব্রাদার। একেবারে যাকে বলে রাজা লোক। একটা অভ্রের খনির পার্টনার, আরো এদিকে-সেদিক কি সব ব্যবসা আছে—সব জানি না। কি একটা যেন বিদ্‌কুটে মস্তবড় নাম ভদ্রলোকের। এক এক সময় মনে পড়ে আবার ভুলে যাই, সেনামে অবশ্য লোকে চিনবে না। ওর কর্মচারী থেকে শুরু করে রাস্তার লোক পর্যন্ত ওকে ক্যাঙ্গারু সাহেব বলে জানে। খোঁড়া সে জন্যে বোধহয় না, ক্যাঙ্গারুর পেটের থলেতে যেমন বাচ্চা থাকে, ওর সঙ্গে সব সময়ে তেমনি বিলিতি বোতল থাকে। শুধু ছিপি খোলার যেটুকু অপেক্ষা। তবে চিরকাল নাকি এমন ছিলনা শুনতে পাই···বাঁ-পাটা হারাবার পর থেকেই নাকি···কি একটা কেচ্ছা আছে, কানা ঘুষো শুনতে পাই, স্পষ্ট জানেনা কেউ। জানবে কি করে, বেনারসে আর কদিন থাকে। ঘুরে বেড়ায় তো বাইরে বাইরেই বেশি। কখনও দিল্লী কখনও বা জব্বলপুর, ব্যবসার জন্যেই। আমার সঙ্গে আলাপ মাস আষ্টেক আগে, একটা ছবির ব্যাপারে—

ছবির ব্যাপারে মানে? শোভনের কৌতূহল আরও বাড়ল।

ব্যাপারটা যে কি আমিও ভাল করে জানি না। মাস আষ্টেক আগে একদিন সন্ধে বেলায় ভদ্রলোক প্রথম আমার দোকানে আসেন একটি জখম ক্যামেরা নিয়ে। দামী ক্যামেরা কিন্তু প্রচণ্ড চোট লেগে জায়গায় জায়গায় তুবড়ে গেছে, চাবিটা গেছে নষ্ট হয়ে। রিল গোটান যায় না এমনি অবস্থা ভদ্রলোক বললেন : এর ভেতর থেকে ফিল্ম বার করে প্রিন্ট করে দেবেন তিনকপি করে। দাম যা লাগে তা তো দেবই, কাজ দেখে খুশি হই যদি তাহলেও কিছু পাবেন। হয়ত গোটাকতক এনলার্জও করাব ফুল সাইজ, যত্ন করে করবেন কাজটা।—আলাপ সেই থেকেই। লোকটা যে মেজাজী আর টাকার লোক, টের পেয়েছি ক্রমে ক্রমে।

আচ্ছা, আজ আমি তাহলে—রাত অনেক হল।

বেনারসে আছেন তো কিছুদিন? আসবেন কিন্তু স্যার। কী আর বলব আপনাকে।

খানিকটা রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে আবার দোকানে ফিরে গেল মুরলীধর।

পাঁচ

বেনারসে ভোর হয় সকলের আগে। কথাটা শুনতে কেমন কেমন লাগে বটে কিন্তু অতি সত্যি কথা।

যে অঞ্চলটা গঙ্গার কণ্ঠলগ্ন হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে বয়ে গিয়েছে, চৌষট্টিঘাটের প্রায় বার আনা যার বুকের মধ্যে নেকলেসের মত করে সাজানো, আর অগুন্তি মন্দির-বাড়ি-অট্টালিকা-চোরাগলি জট পাকিয়ে আছে, সেখানে মোরগের ডাকে ভোর হয় না, সগু জাগা কাকের ফ্যাকাশে কণ্ঠস্বরেও তার ঘুম ভাঙেনা। কারণ, তার ঘুম ভাঙে রাত থাকতে।

গঙ্গাজলের কলের ছপছপ শব্দ, ছড়াঝাঁট, পিতলের বাসন-কোসনের পাতলা রিন রিনে আওয়াজ আর অষ্টোত্তর শতনাম থেকে শুরু করে পুণ্যশ্লোক নলরাজা এবং পঞ্চসতীর নামাবলী দাঁতপড়া ফ্যাঁসফেঁসে গলায় সুর হয়ে বেরোবার চেষ্টা করে।

বৃদ্ধবৃদ্ধার ঘুম ভেঙে গেলে বেনারসে তখন ভোর হতে বাধ্য। সকল প্রকার শুচিতা রক্ষা করতে করতে আকাশে আবছা ভোরের আলো এসে যায়। তখন গামছা হাতে বেরিয়ে পড়ে দলে দলে। কেউ মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে, কেউ নড়া দাঁতে কাঠ কয়লার কি তামাক পাতার গুঁড়ো সাবধানে ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে। তখন কমণ্ডলু আর কলসি, ঘটিবালতি আর মৃদু কথাবার্তা একসঙ্গে মিলে মিশে গলিপথ দেখতে দেখতে সরগরম করে তোলে। গঙ্গাজল আসে তুলসীসইকে ডাকতে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার নিঃস্ব হয়ে, একাএকা। হাঁপানীর টান ওঠে দেওয়ালে দেওয়ালে, ছায়া আসে ম্লান হয়ে, লণ্ঠন নিষ্প্রভ। হুঁকোর শব্দ, ফুলমালীর ছুটোছুটি, মাখনওলার হাঁক, পায়রা-নামান ডাক··· একের পর এক শব্দের মিছিল চলে যেন।

এই ভোরে উঠে পড়ে বিনীতা। চৌকাঠে চৌকাঠে জল ছিটিয়ে কলঘরে গিয়ে ঢোকে। তারপরে সেখান থেকেই সোজা চলে যায় তেতলার ঠাকুর ঘরে।

পুজো কি মন্ত্রপাঠ সেরে নিচে নেমে' এসে শ্রীনিবাসকে তুলে দেয়। শ্রীনিবাস এসে তাড়া লাগায় ঠাকুরকে। বাসন মাজার ঝি আসবার আগে বাসনপত্র বের করে দিতে হবে রান্নাঘর থেকে। লেখা ততক্ষণে চায়ের উনুনে আঁচ দিয়ে ফেলে। বিনীতা ফিরে এসে তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে পিঁড়িতে জুত হয়ে বসে।

এই বিনীতা আর একঘণ্টা আগের বিনীতা যেন তুজন। আগের জনের চেয়ে এ যেন বয়সে অনেক ছেলে মানুষ। হেসে কথা বলে, ছটফট করে কাজ করে। এ যে এম. এ পাশ করেছিল কোন দিন পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে, বিশ্বাস হয়না কথাটা—চায়ের নেশায় যখন ছটফট করে, পাশের বাড়ির বুড়ীর শতনাম শুনে হাসিতে ঠোঁট বাঁকায়। লেখা এসে রাক্ষুসির তুধের জন্যে ধর্ণা দিলেও সে সোজা হয়ে বসে চা-ছাঁকতেই থাকে, ভ্রূক্ষেপ করে না।

বিনীতা আজকেও পিঁড়িতে জুত হয়ে বসে লেখাকে বলল, হাতে হাতে একটু সাহায্য করতো বাপু, খাবার তৈরি করতে হবে তাড়াতাড়ি। রাক্ষুসির তুধের জন্যে তোমায় অত মাথা ঘামাতে হবে না। মা না হয়েই এত—নে নে।

লেখার মুখ পলকের জন্যে আরক্ত হয়েই বিবর্ণ হয়ে যায়। ঘাড় হেঁট করে তবু বলে, কিন্তু এই সময়েই যে ও রোজ খায়।

বিনীতা কোন কথা না বলে কটাক্ষ করে ওর দিকে তাকায়।

মন্ত্র নিয়েছে আজ ক-বছর। অথচ কাকে যে মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ডেকে চলেছে দিনের পর দিন, আর কি জন্যে যে ডেকে চলেছে তা মাঝে মঝে ভুল হয়ে যায় বিনীতার। প্রার্থনা একটা ছিল বৈকি মনে মনে,

নিষ্ফল পাথরে ঘষা লেগে লেগে আজ তার ভাষা অস্পষ্ট। প্রতীক্ষা হয়ে গেছে অর্থহীন, আঘাতে আঘাতে অবুঝ বিশ্বাসও শেষ পর্যন্ত গেছে ধুলো হয়ে গুঁড়িয়ে। এখন যা কিছু সে শুধু পুরাতন অভ্যাসের অনুবর্তন মাত্র। তার মধ্যে না আছে প্রাণ, না আছে প্রত্যয়। অভ্যাসের যে সহজ আকর্ষণে রাত্রে আমাদের চোখে ঘুম আসছে দিনপ্রতিদিন, মাত্র দুটি পায়ে ভর করে আমরা বাকি জীবনটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি স্বচ্ছন্দে। বিছানায় শুয়ে থাকলেও হাঁটতে ভুলে যাচ্ছি না ; আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে দেহযন্ত্র তার কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারেও ফাঁকি দিচ্ছে না। বিনীতার আহ্নিক পুজোআচ্চা সেই অভ্যাসেরই একটি গতি মাত্র, কোন মানসিক সংস্কার নয়।

ঈশ্বর নামে কোন অমানুষিক সত্তার অস্তিত্ব যদি থেকেই থাকে, তবে সেই বধিরের বিরুদ্ধে বিনীতার অভিযোগ এবং অভিমান সামান্য নয়। মানুষের সমস্ত প্রস্তাবনাকে অবুঝ রসিকের মত কেবল দু-হাতে ভাঙাতেই যার দায়িত্ব ফুরোয়, তার কাছে বিনীতার কোন বক্তব্য নেই। সমস্ত জীবনটা যা নয়-ছয় হবার হয়ে গিয়েছে, আর তা জোড়া লাগবার নয়। তার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা রুচি স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল কত অনায়াসে। পৃথিবীর এক কণা ক্ষতি হল না তাতে। সংসারের মনে এক মুহূর্তের জন্যেও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল না। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের পরমায়ু কত অল্প এ তো তারই প্রমাণ। শরীরের বেঁচে থাকার নাম যদি হয় আয়ু, মনের বেঁচে থাকার নাম তবে পরমায়ু। বাংলা দেশের মেয়েদের পরমায়ু অতি অল্প। অধিকাংশই বিয়ের আগে পর্যন্ত বাঁচে, কেউ কেউ বিয়ের পরে কয়েক বছর মাত্র। বিনীতা তাও বাঁচেনি।

খাবার তৈরি করা হয়ে গেলে উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিল বিনীতা। লেখা এসে খুকীর দুধের জন্যে দু-দুবার তাগাদা দিয়ে গেছে এর মধ্যে। কিন্তু বিনীতার মুখ গম্ভীর দেখে বিশেষ ভরসা

পায় নি। অন্য দিন হলে লেখার সঙ্গে এই সময় বিনীতা হাল্কা মেজাজে গল্প করে, নিজের মনেই গুনগুন করে গান করে তারপর বিনীতার ছোট দেওর সুধীরকে চা-খাবার পাঠিয়ে দিয়ে দু-জনে এক সঙ্গে বসে চা খায়। তখন দু-জনে খুব কাছাকাছি হয়, দেখলে মনে হয় দু-সখী।

কিন্তু আজ আবহাওয়াটা সে রকম নয় দেখে বিনীতার কাছ থেকে লেখা সরে সরেই থাকছে। বিনীতাকে লেখা ঠিক বুঝতে পারে না, তাই বিনীতার আদরগুলোকে সে ধমকের চেয়ে বেশি ভয় করে, আর যখন গম্ভীর হয় তখন ধারে-কাছে থাকে না।

কেটলির ঢাকনা বাষ্পের ধাক্কায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। জল ফুটে এসেছে। বিনীতা হাঁটুর ওপরে চিবুক রেখে সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছে অন্যমনস্কভাবে। কেটলির ঢাকনা যখন ভেতর থেকে ধাক্কা খেয়ে এমনি বাজতে থাকে তখন বিনীতার নিজের জীবনের কথাই ফিরে ফিরে মনে পড়ে। তার আগাগোড়া জীবনের মর্মকথা এইটুকুই। ভেতরে জল, শুধু জল, ঘুরে ঘুরে একই কথা বলে চলেছে—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। কিন্তু সমস্ত আবেগ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে ফিরে আসছে বারে বারে, ঢাকনা সরছে না কিছুতেই। পাথরে মাথা খোঁড়ে যে জল সূর্যের আলো দেখবে বলে, তারও এই একই কথা।

অভিমানে একদিন ভেবেছিল অচেনাকেই জয় করে নেবে ধৈর্য দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এবং সম্ভব হলে হৃদয় দিয়ে। পুরুষের কাঠিন্যকে ঘৃণা করলে চলবে কেন, কাপুরুষতা তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণ্য। যে ছিনিয়ে নিতে জানে না, দ্বিধায় পিছিয়ে পড়ে বার বার, তার জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করা নিজেকেই অপমান করা। বিনীতা ভেবেছিল, তাই হবে, মা-বাবার ইচ্ছাকেই মেনে নেব। বাংলা দেশের মেয়েরা সব পারে। বিলেত ফেরত কাজের মানুষকেই ভালবাসতে চেষ্টা করব প্রাণপণে। তার জন্যে নিজের স্বভাবকে যদি নানাদিকে সঙ্কুচিত করতে হয়, চিকের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাতেও

রাজি। মানিয়েই যদি নিতে না পারি তাহলে আমার এত শিক্ষার মূল্য কি রইল।

চেষ্টার কোন ক্রুটি ছিল না বিনীতার। কিন্তু হল না। জোর করে কাউকে ভালবাসা যায় না এবং সেভাবে ভালবাসতে যাওয়া যে কত বড় বিড়ম্বনা, দিনের পর দিন টের পেতে লাগল বিনীতা। নোনা জলে চরিত্র খোলেনি সন্তোষের একটুও। বরং মেয়েদের সম্বন্ধে তার মন যেন আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। সে চায় তার স্ত্রী থাকবে কাচের আলমারির পুতুলের মত তার নিভৃত ঘরের সামগ্রী হয়ে। বাইরের আলো-হাওয়ার প্রয়োজন পুরুষের, মেয়েদের নয়। চারদিকে পর্দা দিয়েও সন্তুষ্ট নয় সন্তোষ, পারে তো তাকে বোরখা পরায়। বিনীতার অপরাধ সে যথেষ্ট পরিমাণে সুন্দরী, পাঁচজনে পথেঘাটে তার রূপের প্রশংসা করে। শুনে সন্তোষ মনে মনে জ্বলে যায়। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে এক সময় কার্পণ্য করে নি সন্তোষ, কিন্তু যে মেয়েমহলে মিশেছে তাদের চেহারা প্রহরে প্রহরে বদলায়। সেই সন্দিগ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে সন্তোষ বিনীতার অকপট আত্মসমর্পণকে, সত্যভাষণকে বিচার করল। বলা বাহুল্য, ফলাফলটা খুব সুখের হল না।

প্রথম থেকেই বিনীতাকে সে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। সব ব্যাপারে চোখে চোখে রাখছিল। বাড়িতে খুশিমত নাটক নভেল আনা চলবে না, চেঁচিয়ে হাসা বা গান করা চলবে না। কারণ তার ধারণা, মেয়েরা এ সমস্ত বাইরে-কে লক্ষ্য করে করে। বিনীতা উচ্চশিক্ষিতা। মেয়েদের এতদূর পড়াশোনা করায় সন্তোষের রীতিমত আপত্তি আছে। কিন্তু সেটা যখন বিয়ের আগেই ঘটে গেছে তখন সতর্ক থাকা ছাড়া উপায় নেই কিছুই।

বিনীতার মনে নিজের ওপরে প্রথমটায় খুব আস্থা ছিল। সে ভেবেছিল পুরুষের মনকে একটি মেয়ে তার নিষ্ঠা ধৈর্য এবং সততা দিয়ে জয় করে নিতে পারে। মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ শেষ পর্যন্ত মন-গড়া। তাই যে-কোন পরিস্থিতিকে বশে আনতে পারার মধ্যেই

মেয়েদের চরিতার্থতা। নিজেকে সম্পূর্ণ রকমে ত্যাগ করতে পারলে, অন্তরাল না রেখে অবশিষ্ট না রেখে সমর্পণ করতে পারলে, তবেই ভোগের অধিকার জন্মায়, তবেই দ্বিগুণ করে পাওয়া যায়। আগে থেকে চেয়ে বসলে শেষ পর্যন্ত কিছুই হাতে আসে না।

কিন্তু বিনীতার আদর্শ চুরমার হয়ে যেতে বিলম্ব হল না। শোভনের নামটা বেশ পল্লবিত হয়েই সন্তোষের কানে পৌঁছেছিল। যার ফলে তার কৌতূহল সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করতে শুরু করেছিল মধ্যে মধ্যেই। বিনীতা একটি দুঃসাহসিক কাজ করেছিল এই সময়। সন্তোষকে সরাসরি বলেছিল: তুমি নিজেকে এত ছোট কর কেন? তোমার যা কিছু জানবার সোজাসুজি আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পার।

সন্তোষ ভ্রূভঙ্গী করে বলেছিল, জিজ্ঞাসা করলেই সমস্ত আমার জানা হয়ে যাবে বলছ?

একবার পরীক্ষা করে দেখলেই পার। আমি তো তোমাকে কিছুই লুকোতে চাই না।

ভালো কথা! শোভন ছেলেটি কে?

আমার ছোটবেলার বন্ধু। আশ্চর্য না-কাঁপা গলায় বিনীতা স্বীকার করেছিল, আমাকে সে ভালবাসত।

কয়েক মুহূর্ত কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সন্তোষ নির্লজ্জের মত বলেছিল, আর তুমি তার বদলে কি করতে?

ধৈর্য তখনও হারায় নি বিনীতা। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত ও সংযত করে উত্তর দিয়েছে, আমিও তাকে ভালবাসতাম।

এর পরে যদি আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকত সন্তোষের তাহলে ভাল হত কিন্তু সন্তোষ আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেনি। বুকের ঠিক মাঝখানে গুলি লাগলে এইভাবেই থেমে যায় মানুষ।

সেই থেকেই আসলে ভাঙন ধরল স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে। সন্তোষের ধারণা বদ্ধমূল হল বিনীতা তার সঙ্গে ছলাকলা করছে, তার

চুপ করে থাকা কিংবা গায়ে পড়ে কথা বলতে আসা দুটোই অভিনয়। কিন্তু লোকটা শুধুমাত্র সন্দেহ প্রবণ হয়েই ক্ষান্ত দেয়নি, পরবর্তী মুহূর্তে অতিমাত্রায় লোভও ব্যক্ত করে বসেছে। তখন ঘৃণায় মিশিয়ে গেছে বিনীতা। ঘৃণা, নিঃশব্দ ঘৃণা দিয়েই বুঝি দগ্ধ করতে চেয়েছিল সন্তোষকে। দগ্ধ হলও শেষ পর্যন্ত সন্তোষ, কিন্তু সে নিজেরই আগুনে, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে।

সেই ভয়ঙ্কর রাতটির কথা মনে পড়লে আজও বুকের ভেতরটা ভয়ে শুকিয়ে আসে। শিলং-এ তখন তারা একটা বাড়ি ভাড়া করে হাওয়া বদলাতে গেছে। রাক্ষুসি হওয়ার পর থেকেই শরীরটা তিল তিল করে খারাপের দিকেই যাচ্ছিল বিনীতার। অসুখ নেই কিছু অথচ। ডাক্তারি বিধানে তাই অগতির গতি শিলংয়ের পরামর্শ ছিল।

কিন্তু শিলংয়ের সেই অভিশপ্ত বাড়িটিই ধ্বসের মত নেমে এসেছিল তাদের জীবনের উপর। ছোট্ট একটি পার্টি ছিল সে সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে। ব্যবসায় সূত্রে জড়িত কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছিল সন্তোষ। সেই দিনই যে একটা কিছু ঘটবে তা আগে থেকেই আশঙ্কা করেছিল বিনীতা। সকাল থেকেই সন্তোষ সেদিন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না। বিকেলের দিকে লালচে চোখ, উস্কোখুস্কো চুল, ঈষৎ অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল বিনীতা। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা অনুমান করতে পারেনি। সন্তোষ সুইসাইড করবে, এ ধারণার বাইরে ছিল বিনীতার। অবশ্য সুইসাইড প্রতিপন্ন হয়নি লোকের কাছে। অ্যাকসিডেন্ট বলেই ধরে নিয়েছিল সবাই, মায় পুলিশ পর্যন্ত। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ব্যালান্স হারানো তো স্বাভাবিক। কিন্তু বিনীতা জানে, ঘটনাটা তা নয়। সুইসাইড। তবে লক্ষ্যটা কেবলমাত্র নিজের উপরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সন্তোষের চরিত্রই সেরকম নয়।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়েছিল। আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি

মুছে ফেলে চা ছাঁকতে বসল। দুঃস্বপ্নের কথা ভাবার চেয়ে শোভনের কথা ভাবা ঢের সহজ। অন্তত ভয়ের নয়। শোভন, সেই হাফ্‌প্যাণ্ট পরা শোভন, যে তাকে তুলতে এসেছিল শ্যাওলা-পিছল উঠোনের কোণ থেকে। যার সামনে সে প্রথম বড় হয়েছিল। প্রথম লজ্জা পেয়েছিল, পুতুল ছড়িয়ে গিয়েছিল হাত থেকে পড়ে। স্পষ্ট মনে আছে। পুতুলের মৃত্যু হয়েছিল সেই দিন থেকেই। সেই শোভন—তার কৈশোর জীবনের বন্ধু। যার সামনে সে পড়ে গিয়েছিল, পড়ে গিয়েছে, একবার নয়, বারবার। সাহায্য করতে এসেছিল, পারেনি। হাত ধরে তুলতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, পারেনি ওপরে পৌঁছে দিতে কাপুরুষ! কিন্তু তবু তাকে ভোলা যায় না।

ধূপের আগুন দেখা যায় না কখনও। কিন্তু গন্ধই তার দহন-কথা প্রকাশ করে দেয়। শোভন জ্বলছে। মেয়ে হয়ে বিনীতা কি সে কথা টের পায়নি! কিন্তু কি হবে সেকথায় আজ, শোভন বড় দেরিতে এসেছে। সেই গানটা মনে পড়ছে, যেটা সে প্রায়ই গায়ঃ এসেছিলে তবু আসো নাই জানায়ে গেলে। এছাড়া তার আর কি কান্না আছে, যা সে কাঁদতে পারে সারা জীবন সুরের পর সুর চড়িয়ে। শোভন আসেনি, সেই কথাই তো শোভন আজ জানাতে এসেছে। দুঃখ শুধু বিনীতাকে ভুল বুঝেছে শোভন।

চা-জলখাবার নিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে অবাক হল বিনীতা। লেখা তিনতলার ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। এপর্যন্ত লেখার সঙ্গে শোভন দুটি-একটি কথা যে না বলেছে তা নয়, লেখাও জবাব দিয়েছে তার স্বভাব-সংক্ষিপ্ত গলায়। কিন্তু তা বলে এই সাত-সকালে লেখার মত মেয়ে যে একা উপরের ঘরের সামনে গিয়ে

দাঁড়াবে তা সত্যিই আশ্চর্যের। ওপরে উঠে অবশ্য ব্যাপারটা স্পষ্ট হল তার কাছে। শ্রীমতী রাক্ষুসি আবার কাণ্ড বাধিয়েছেন।

বাহিকা সুদ্ধু ওপরে তার নতুন বন্ধুকে দেখতে এসেছে। আজ আর সঙ্কোচ নেই। কোলে উঠেছে, এটা-ওটা জিজ্ঞেস করছে প্রয়োজন বোধে 'হাম' খাচ্ছে।

কিরে, বায়না ধরেছে বুঝি সকাল বেলাতেই ?

লেখা ঘাড় নেড়ে নিচে নেমে গেল। বোধহয় দুধের তদবির করতে। মায়ের গলা শুনে রাক্ষুসি দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার দেখতে পেয়ে মাথা দুলিয়ে হেসে বলল, মা।

বড় বাহাদুরি করেছ বেইমান কোথাকার—টিপয়ের ওপরে খাবারের ট্রে নামাতে নামাতে বিনীতা মেয়েকে জিভ ভেঙাল। রাক্ষুসি তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাব দিল শোভনের কোল থেকে।

শোভন হেসে ফেলে বলল, উঁহু ! আমি এসব গৃহবিবাদের মধ্যে নেই। তোমরা স্ত্রীজাতি অতি গোলমেলে—

মোটেই না ! আমাদের মর্ম তুমি বুঝবে কি ? যাক, আমার মেয়েটাকে বাগানো হয়েছে দেখছি ভালমতই।

এইখানেই ভুল হল তোমার। আমি না, তোমার মেয়েই আমাকে বাগিয়েছে রীতিমত। সবে দাড়ি কামিয়ে উঠেছি কি এসে হাজির, তারপরে বোঝ ব্যাপার— ! ভ্রূকুটি করে তাকাল বিনীতা।

মসৃণ গালে পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাত বুলতে বুলতে শোভন বলল, নতুন ক্ষুরে দাড়ি কামালে নিজের গালে নিজেরই ইচ্ছে করে—বুঝেছ …তা বালিকার দোষ কি। দোষের মধ্যে, আমার মনে হয়, তাঁর উঁচু দাঁতটি বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ !

শুধু তোমার ক্ষুর নতুন নয় দেখছি। ঠাট্টাও নতুন ধরণের করতে শিখেছ ! আগে তো মুখে রা বেরোতো না, প্রফেসার হলে অনেক উন্নতি হয় দেখছি !

কয়েক মুহূর্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শোভন বলল, এবার

তুমি সত্যিই চটে গেছ দেখছি! শুধু আমার উন্নতি দেখলে, এদিকে তোমারও যে হুহু করে—

থেমে যাওয়া কথার প্রতিধ্বনি করল বিনীতা, হুহু করে?

হুহু করে তোমারও চারিত্রিক উন্নতি হয়েছে। তুমি দিব্যি শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়েছ।

তোমাদের সঙ্গে আমাদের ওইখানেই তফাত। নাও, ওসব কথা রেখে খাবারে হাত লাগাও।

শোভন বলল, তোমার দেওরটিকে কাল থেকে দেখছিনা কেন? বেশ একটু গল্পগুজব করা যেত। তোমাকে তো আর সব সময় পাওয়া যায় না, তোমার মেয়েকেও—রাক্ষুসিকে শোভনের কোল থেকে নিতে নিতে বিনীতা বলল, সুধীর করবে তোমার সঙ্গে গল্প! তবেই হয়েছে। ও-যা লাজুক, লেখার সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলে না। রাতদিন নিজের ঘরে বই নিয়ে বসে রয়েছে। কলেজ ছুটি হয়েছে, বললাম কালকে, বাড়ি যাও ঠাকুরপো, কয়েকদিন ঘুরে এস। তা বলল, বাড়িতে বড্ড হৈ-চৈ। আমার ভাল লাগে না।

তোমাকে খুব ভালবাসে ছেলেটি, না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ও বাড়িতে সুধীর ছাড়া আমার কেউ আপনার জন ছিল না। ওর দাদা মারা যাবার পর থেকেই ও যেন আরও বেশি করে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে—মায়ের কাছে পর্যন্ত যেতে চায় না। তাইতো ওবাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে এসেও একেবারে ছাড়া পেলাম না। অথচ—

অথচ কি?

সুধীর ওর দাদার নিজের মায়ের পেটের ভাই নয়। মামাতো ভাই। ওদের আশ্রয়েই মানুষ হয়েছে এতদিন।

আশ্চর্য তো! চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, কিন্তু তোমার চা, তুমি খাবে না?

খাবো নিচে গিয়ে। নইলে লেখা বসে থাকবে।

তোমার মেয়ে কিন্তু তোমার মতই হবে। এর এ রকম নাম দিলে কেন হঠাৎ। খুব সুন্দরী হবে দেখো।

সে কি আমি অস্বীকার করছি। ও একশ বার সুন্দরী হোক না কেন, তবু ও রাক্ষুসি। ওর দাঁত উঁচু—

এ কিন্তু সেই বিম্ববতীর সতীন-মায়ের মত কথা হল। নিজের মা অন্য কথা বলবে। তাছাড়া ও তো একটা দাঁত। তাতে ওকে আরও ভালই দেখায়। ও তোমাকে কিছু দাঁত দেখাতে আসেনি। শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আমি ওর দাঁতকে বিলক্ষণ পছন্দ করি।

হাসতে হাসতেই কথাটা বলেছিল। বলতে গেলে লঘু সুরেই কথা হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। বিনীতা এবার যেন কি রকম হয়ে গেল। বলল, কিন্তু ও দাঁত যে আমার বুকের মধ্যে বিঁধে রয়েছে শোভন। ওটা সন্তোষের দাঁত। আমার সমস্ত শান্তি নষ্ট করেছে ওই দাঁত··· আমার সমস্ত—

কথাটা শেষ না করেই উচ্ছ্বসিত আবেগ চাপতে চাপতে বিনীতা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মুখ দেখতে পেলনা শোভন কিন্তু স্বর পরিবর্তন লক্ষ্য করল। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে বিনীতার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে একটা হাত রাখল আস্তে করে।

বিনীতা ?

চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিনীতা বলল, কী ব্যাপার! এটাও কি তোমার রসিকতা নাকি? লেখা কি শ্রীনিবাস যদি এসে পড়ত এসময়, তাহলে কি ভাবত বলত ?

নিশ্চয়ই খারাপ ভাবত। একটু সরে দাঁড়িয়ে শোভন বলল, কিন্তু আমরা তো সত্যিই খারাপ নই! কতদিন পরে তোমাকে ছুঁলাম। তোমার কি হয়েছে বলত ?

আবার সহজ গলায় বিনীতা বলল, কিছুই হয়নি তো। মেয়ে বড় হয়েছে মনে রেখ। তার সামনে—

শোভন বিনীতার কথাটাকে ইচ্ছেমত ঘুরিয়ে নিল। বলল, বড় হয়েছে সেই জন্যেই তো ভাবনা। তুমি কি করছ বলত। মেয়েকে তো এবার মানুষ করে তুলবার দায়িত্ব তোমার। এই তীর্থস্থানে পড়ে থাকলেই তো সে কাজটা হবে না। তুমি কলকাতা ফিরে চল। হাজার হলেও বাংলাদেশের মেয়ে তুমি, সারা জীবন অন্য কোথাও পড়ে থাকবে কেন। মেয়েকে পড়াশোনা গানবাজনা শেখাবার ব্যবস্থা করে দাও। কলকাতাই তার উপযুক্ত জায়গা—

আমি কলকাতা যাবো? বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে তাকাল বিনীতা।

তার এই ছেলেমানুষী ভাল লাগল শোভনের। বলল, নিশ্চয়, তুমিই কলকাতা যাবে। এভাবে ঘরের মধ্যে পড়ে থেকে থেকে মরচে ধরে যাচ্ছে যে, লেখাপড়া শিখেছিলে, গান শিখেছিলে—ওখানে গিয়ে কোন একটা স্কুলে দিব্যি কাজ পেতে পারো। টাকার জন্য বলছিনা—

কি একটা দুর্দম আবেগ শোভনকে যেন পেয়ে বসেছে। কথা তার আর থামতে চায় না। বলল, দোহাই তোমার, ঢের হয়েছে আর না! নিজেকে এভাবে নষ্ট করতে তুমি পাবে না।

নিজেকে আমি নষ্ট করছি? হাল্কা গলায় হাসবার চেষ্টা করল বিনীতা। কিন্তু হাসি বেরোলো না। খুব মজার কথা বলতে পার তো শোভন—

কর্ণপাত করল না শোভন। নিজের খেয়ালে বলেই চলল। তাছাড়া তোমার ব্যবসার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবো আমি, তবে সর্ত থাকবে, তোমার বারআনা শেয়ার······দেখি ভেবে দেখি, তুমিও ভেবে দেখ—

বিনীতা অস্ফুট আর্তনাদের মত গলায় বলল, সত্যি! সত্যি বলছ?

ছয়

ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয় প্রবাদ আছে। দর্শনে পুরো নেশা হয় এটা প্রবাদবাক্য নয়, তবে প্রমাণ বাক্য।

খেলার নেশাই অন্তত সেই রকম নেশা যা দেখার মধ্যে দিয়েও জমে ওঠে। যারা খেলে এবং যারা খেলা দেখে দু-দলই মাতাল হয়। কম-বেশি তফাৎ পর্যন্ত করা যায় না। তা যদি না হত তাহলে ধর্মশালার বারান্দার পুব-কোণে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত এই মধুচক্রটি বসত না। একটি মাত্র দাবার ছক্‌কে কেন্দ্র করে এতগুলি মৌমাছির ভিড় হত না।

এই আসরের প্রধান খেলোয়াড় হচ্ছেন দু-জন। ধর্মশালার ডাক্তার এবং ধর্মশালা-সংলগ্ন হোটেলের ম্যানেজার বিরূপাক্ষবাবু। সম্প্রতি আরও দু-জন এসে জুটেছে। তারা দীর্ঘ সময়ের জন্যে না হলেও নিয়মিতই খেলায় হাজির থাকে। একজন মুরলীধর নিজে, অপরজন মুরলীধরের অন্যতম এল্ডার-ব্রাদার শোভন। মুরলীধরই তাকে এখানে এনেছে। দাবা খেলায় শোভনের ব্রেন খুব সাফ। ডাক্তার শঙ্করবাবু তাকে খুব তারিফ করেন। খেলায় দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকেন স্থানীয় কয়েকজন বৃদ্ধ এবং ধর্মশালার অতিথিদের নিত্য নতুন মুখ।

কুমার ইন্দ্রারিজিৎ ভট্টর সঙ্গে এই দাবার আসরেই আলাপ হয়ে গেল শোভনের! ধূমকেতুর মত কোন কোন দিন তিনি এই-খানে হানা দেন। হয়ত বা কয়েক মিনিটের জন্যে। ক্রাচে ভর দিয়ে স্মিত মুখে সিগার কামড়ে তিনি দাবার বোড়ের চলাচল লক্ষ্য করেন খানিকক্ষণ কিন্তু বেশ বোঝা যায় খেলা দেখতে তিনি

আসেন নি। একটু পরে খেলা স্থগিত রেখে শঙ্করবাবু ভিড়ের আড়ালে কোথায় উঠে যান। সেই ছন্দপতনটুকু দর্শকরা খেলার সমালোচনা দিয়ে ভরে তোলে, অস্ফুট গুঞ্জনে। তারপর ডাক্তার আবার ফিরে আসেন কিন্তু কুমার ভট্ট অর্থাৎ ক্যাঙ্গারু সাহেবকে আর ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় না।

এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান কেউ প্রয়োজন বোধ করে না। শুধু বিরূপাক্ষবাবু চশমার কাচের ওপর দিয়ে বাঁকা চোখে একবার তাকান। সাপের চোখের মত হিমতীক্ষ্ণ সে চাহনি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে অসময়ে টানা-হেঁচড়া করা বোধহয় তিনি সুনজরে দেখেন না। খেলার আগে বা পরে এসে পড়লে ভট্ট কারও না কারও সঙ্গে কোন না কোন বিষয় নিয়ে তর্ক করেন। এই রকমই এক তর্কের মুহূর্তে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল শোভনের।

ভদ্রলোক কথা বলেন, আশ্চর্য চমকপ্রদ এক একটি কথা। এক একটি কথা শুনলে বোঝা যায় লোকটার মধ্যে আগুন আছে। অভিজ্ঞতা নিংড়ে নিংড়ে যেন তাঁর মতবাদ তাঁর যুক্তি জমে উঠেছে। মতের অমিল হতে পারে কিন্তু অশ্রদ্ধা করবার উপায় নেই। কথা শোনবার লোক আছে অনেক, কথা বোঝবার মত লোক বড়ই কম। ভট্ট জানেন সে কথা। তাই মুখ খুলতে চান না। এবং সেই একই কারণে শোভন সরকারকে তাঁর ভাল লাগে। অল্প বয়সী হলেও তাঁর কথা বোধহয় একমাত্র সেই বোঝে, সময় সময় তারিফ করবার মত জবাবও দেয়।

সেদিন খেলা সবে ভেঙেছে এমন সময় খট্‌খট্‌ শব্দতুলে ভট্ট এসে দাঁড়ালেন ডাক্তারের সামনে। খান তিনেক দশটাকার নোট শঙ্করবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে ভারি গলায় বললেন, ওহে ডাক্তার,

দেখ তো আমার শেষ পর্যন্ত ব্লাড প্রেসার দাঁড়িয়ে গেল কিনা।
নর্মাল প্রেসার যেন কত?

টাকাটা কিসের দরুন বোঝা গেল না। তবে নাড়ি টেপার জন্য যে নয় সেটা স্পষ্ট। ডাক্তার তাঁর ঘড়ির পকেটে নোটগুলিকে তিন ভাঁজ করে ঢোকাতে ঢোকাতে বাঁকা হাসি হেসে জবাব দিলেন, চিংড়ি মাছ আবার মাছ, তার আবার রক্ত! তোমার দেহে কি ব্লাড আছে হে ভট্ট, যে তার আবার প্রেসার থাকবে?

ভট্ট অবাক হয়ে কব্জি ঘুরিয়ে নিজের বলিষ্ঠ হাত খানা দেখতে দেখতে বললেন, আমার শরীরে তবে কি আছে?

ডাক্তার তাঁর একগুচ্ছ কেশ সম্বল টাকটিতে সন্তর্পণে হাত বুলতে বুলতে বললেন ওয়াইন প্রেসার মাপা যন্ত্র এখনও এদেশে আসেনি, কুমার। কিছুকাল অপেক্ষা কর—

কথার শেষে ডাক্তার নিজের রসিকতায় নিজেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসলেন। স্পঞ্জের মত ব্রণকলঙ্কিত গাল দুটি ফুলে ফুলে উঠল হাসিক ধমকে।

ভট্ট চটলেন না। ধর্মশালা কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন খোলা গলায়। বোঝা গেল পায়ে খাটো হলেও লোকটা গলায় খাটো নন। হাসি থামিয়ে বললেন, স্যরি, আমারই ভুল হয়েছে। খালাসি ডাক্তারের কাছে আমি মানুষের রক্তের কথা বলতে এসেছিলুম। সরকার, বাড়ি যাবে নাকি?

শোভন বলল, চলুন।

চুপসে যাওয়া ডাক্তার পিছন থেকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন, কুমার দাঁড়াও, আমার কথাটা শোন—

ভট্ট ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

আজ ভট্টর কিছু একটা হয়েছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শোভন ভাবল। খানিকটা পথ গম্ভীরভাবে হাঁটবার পর সিগার চাপা মুখে একটি ইংরেজী গানের কলি ধরলেন কুমার ইন্দ্রারিজিৎ:

লাভ্ ইজ লোনলি অ্যাণ্ড লোনলি ইজ দা স্কাই···সামটাইমস্ ইটস পেইনফুল···লভেটভে কখনও পড়েছিলে সরকার? হঠাৎ সুর থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসেন।

এরকম অসম্ভব প্রশ্ন, বলতে গেলে অতর্কিত প্রশ্ন শুনে প্রথমটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল শোভন। কিন্তু সে ভাব কাটিয়ে সহজ হতে বিলম্ব হলনা। বলল, বাঙালির ছেলে কবে না প্রেমে পড়েছে বলুন—মৃদু শব্দে হাসল শোভন। ধরে নিন আমিও একবার ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম।

ইয়েস, ইউ আর রাইট। পতন অনিবার্য! তবে কিনা, যে মাটিতে পড়ে লোকে তাই ধরেই ওঠে। ওই পথেই উঠতে পারলে তো বেঁচে গেলে, নইলে সেলামী দিয়ে দিয়ে···কিছু মূল্য দিতে হয়েছিল তোমাকে?

ভট্টর মুখ থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে। আজ মাত্রাটা বোধহয় একটু বেশিই হয়ে গেছে। শোভনের গলার কাছটা শক্ত হয়ে এল। জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকতে পারত, কারণ এসব প্রশ্নের কথা দিয়ে উত্তর হয় না সব সময়। কিন্তু আজ তারও যেন নেশা ধরেছে। বলল, আমার সারা জীবন। মনে হয় আপনিও কিছু দিয়েছেন?

ইয়েস, হোয়াই নট! আমারও সারাজীবন এবং আমার এই প্যারাডাইস লস্ট। নিজের কাটা পায়ের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করলেন, লাইফ ইজ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো···ওয়াকিং শ্যাডো—গলার স্বর জড়িয়ে এল একটু। লিকারে বিজনেস ডুবিয়েছি কিন্তু নিজেকে ডোবাতে পারিনি এখনও—কাঠের পা অত সহজে টলে না।

শোভন নিঃশব্দে চলতে চলতে একসময় বলল, আপনার পা গেল কি করে?

মোটর অ্যাকসিডেন্টে। রেজার্স এজ, ক্ষুরস্থ ধারা, বুঝেছ। কিছু না কিছু যাবেই, নো রিটার্ন!

আর তিনি ?

আকাশের দিকে একবার মাথা তুলে তাকালেন। মনে হল, মনের মধ্যে গুনগুন করছেঃ এ্যাণ্ড লোনলি ইজ দা স্কাই। শোভনের কাছে অদ্ভুত লাগল ইন্দ্রারিজিতের এই নির্জন মত্তাবস্থা।

আমার কথা তো তাঁকে জানাইনি কোন দিন—ভট্ট কতক্ষণ পরে উত্তর দিলেন। তারপর স্বগত কণ্ঠে আবার সেই গানের অন্য অংশ সুরে আনলেনঃ মাই হার্ট ওয়াজ লিট আপ উইথ দা মুন··· মিড নাইট মুন···সাম টাইমস্ ইটস্ পেইনফুল—গভীর চাপা গলায় অদ্ভুত শোনাচ্ছিল লাইনটা। ঘুরে ফিরে পেইনফুল কথাটার ওপরে মীড়ের মোচড় লাগছিল। আকাশে সত্যিই চাঁদ উঠেছিল আজ রাত্রে, কৃশপাংশু চাঁদ নয়। জ্যোৎস্নাভারাতুর আকাশের একপ্রান্তে জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল একখানা আস্ত রূপোর থালা।

আচ্ছা, গুডনাইট সরকার—মুখ থেকে সিগারের টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ বললেন, আবার কিছুকাল পরে দেখা হবে।

কেন, কোথাও যাচ্ছেন নাকি ? কবে ?

ঘাড় নেড়ে ভট্ট বাঁশফাটকার রাস্তায় মোড় নিতে নিতে চেঁচিয়ে বললেন, আজকে নিশ্চয়ই যাচ্ছি না, এই পর্যন্ত বলতে পারি।

শোভনের মাথার মধ্যে কুমার ভট্টের এতক্ষণকার কথাগুলো অতিকায় ছায়ার মত পাক খেতে থাকল।

এই তিনতলা বাড়িটা এখন নির্জন। নির্জন বললে কমিয়েই বলা হয়, প্রায় ভূতুড়ে বাড়ির মত। ভেতরে বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে। গলিটাকে ওপর থেকে ঝুঁকে দেখলে অন্ধকার খাদের মত মনে হয়। গলির মোড়ের আলোটা পর্যন্ত নিভে গেছে। আশপাশের গায়ে গা মেশান বাড়িগুলো যেন প্রতিটি ইট পাথর

নিয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। খোলা জানলাগুলিকে কালো, লেখাহীন শ্লেটের মত দেখাচ্ছে দূর থেকে।

গোটা বাঙালীটোলা কবরখানার মত নিঃস্পন্দ। দোকানপাট, পথে বসা বাজারটুকু যেন পেন্সিলের লেখার মত অপ্রয়োজনে তুলে ফেলা হয়েছে রবার ঘষে ঘষে। শোভন ছাদে এসে দাঁড়াল। আকাশে অনেক তারা। হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে গঙ্গার দিক থেকে। সাবধানে দেশলাই জ্বালিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। আলসের ওপরে ছুটো হাত সমান্তরাল ভাবে রেখে নিচে তাকাল। গলিটার মধ্যে হাওয়া ঢুকেছে কী করে। শুকনো শাল পাতা আর ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে টানাটানি চলেছে অন্ধকারের মধ্যে। খস খস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে। ইঁতুরও হতে পারে।

শোভনের মনের ভেতরটা ওই অন্ধকার গলির মত। ছেঁড়া কাগজের টুকরো ওড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই, স্থির হয়ে শুনলে। এই পাগলা হাওয়া স্মৃতিভারাতুর। এই গলিতে, এই বাড়িতে তার জীবনের কত কথা ছড়িয়ে আছে। প্রায় পূর্ব জন্মের কথা। এই বেনারস, এই নক্ষত্র খচিত অন্ধকার অধ্যুষিত বেনারস, তার বুকের রাজধানী। আজ সে যেন স্বপ্নের ইন্দ্রজালে এখানে পৌঁছে গেছে। প্রিয়ার ভবন, বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে ছুর্গম নির্জন। পথ চিনে চিনে বহুদূরে ফিরে এসেছে আজ। এই তিনতলা বাড়িটা এখন সত্যিই নির্জন। একটা রহস্যময় পোড়ো বাড়ির মত। দোতলায় বিনীতা আর রাক্ষুসি, লেখা আর সুধীর। তিনতলায় সে। ছিল, এখন নেই—এখন ছাদে। একতলায় শ্রীনিবাস আর ঠাকুর। গোটা বাড়িটার সিঁড়িতে-ছাদে-বারান্দায় ঘরে ঘরে কালো ব্লটিং পেপারের মত অন্ধকার সমস্ত আলোর রেখা শুষে নিয়েছে। শুষে নিয়েছে সমস্ত চৈতন্য। ধীর সমীরে যমুনা তীরে—যেন নিভৃত নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষার নিশ্বাস পড়ছে।

খুঁজে পেয়েছে, এতদিনে পরে খুঁজে পেয়েছে শোভন। তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা, চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা। সেই পূর্ব জন্মের প্রথমা প্রিয়ার ছবি। এতদিন পরে সত্যিই খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু সে যুগে মানুষের মনের মধ্যে কোন জটিলতা প্রবেশ করেনি। আজ মনের মধ্যেটা ভগ্নাংশে ভগ্নাংশে সঙ্কুল। বিনীতাকে খুঁজে পেয়েছে কিন্তু বিনীতার সমস্ত মনটাকে খুঁজে পায়নি। সে যে কি চায় আর কি চায় না বোঝা শক্ত। সে যখন চটুল গলায় কথা বলে, অভিমানের ভঙ্গীতে চুপ করে, শোভনের জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তখন মনে হয় কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। যখন অতীতের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, সন্তোষকে বিগত শত্রুর সম্মান দেয়, নিজের মেয়েকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তখন চেনা-চেনা লাগে। মনে হয়, এ সেই বিনীতা, সেই প্রথম-যৌবন-সন্ধিতে উত্তীর্ণ কিশোরী। যে নিদারুণ অভিমানে আত্মহত্যা করেছিল একদিন। চুনারের পাথর ব্যবসায়ী যার শরীরটাকে গ্রাস করেছিল একদিন, কিন্তু মনের নাগাল পায় নি। যে সন্তোষের মৃত্যুর পর শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছে। দিনের পর দিন এই বেনারসের নির্জন বাড়িতে কৃচ্ছ্র সাধন করে চলেছে। এবং যে তাকে চিঠি লিখে দীর্ঘ সাত বছর পরে এই আশ্চর্য শহরে ফিরিয়ে এনেছে। এ এক বিনীতা। একজনেরই তিন-রঙা ছবি। প্রতিটি রঙে রঙে ঘনিষ্ঠতা আছে, মিল আছে। কিন্তু আরও একজন আছে, পাষাণ রূপিনী অহল্যার মত যে নেপথ্যে বাস করছে বিনীতার। তাঁর সংযম আর সংস্কার, তার অসংলগ্ন আচরণ শোভনকে হতাশ করে দেয়। মনে হয় কিছুই বোঝেনি, এই নিকট-দূরের খেলায় সে হেরে গেছে।

আজ প্রায় দশ বার দিন হয়ে গেছে সে এখানে এসেছে। অথচ দু-তিন দিনের মধ্যেই আবার ফিরে যাবে স্থির করেই এসেছিল। যার জন্যে লক্ষ্ণৌয়েব মিথ্যে দোহাই পেড়েছিল প্রথম দিন এসে।

কিন্তু তার ফাঁকি ধরে ফেলেছে বিনীতা। যে দিন থেকে জানতে পেরেছে শোভন একা, সংসার জমিয়ে বসেনি মেদিনীপুরে, সেদিন থেকেই যেন তার আদরের মাত্রা শাসনে গিয়ে ঠেকেছে। বলেছে, এই গ্রীষ্মের ছুটিতে আর মেস বাড়িতে ফিরে যাওয়া চলবে না। দেহের দিকে এখন থেকে একটু একটু নজর দিতে হবে বৈকি। কেউ দেখবার নেই বলে যা খুশি তাই করা চলবে না। অন্তত যতদিন বিনীতা বেঁচে আছে।

শোভনেরও অবশ্য মন্দ লাগছিল না। সাত বছর মেসের রান্না খেয়ে আর একা বাস করে তার মনটাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখানে তাও মনে হয় কেউ আছে। যে তার নিজের লোক। এই বিরাট পৃথিবীর দিকে তাকালে অন্তত একজন কাছের লোক, জানা লোক। তাই হঠাৎ ফিরে যেতেও মন সরছিল না। এত দিন পরে যদি দেখাই হল, দেখাটা স্থায়ী হলে ক্ষতি কি।

ক্ষতি অবশ্য নেই কিন্তু এপথে আর কতদূর এগোবে শোভন? আর কতদূর পর্যন্ত এগোনো যায়? জীবনটা তো একটা অশেষ গল্পগ্রন্থ নয়। তার শুরু আছে শেষও আছে।

বেনারসে দিনের পরে দিন এইভাবে বসে থাকার পিছনে নিশ্চয়ই কেবলমাত্র নিছক বিশ্রম্ভালাপের বাসনা লুকিয়ে নেই। অর্ধচেতন মনের মধ্যে তদধিক অন্য কিছু আছে। না থেকে পারেনা। জীবন একজায়গায় গিয়ে শেষ হবেই। একটা উপসংহারে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে।

সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরাল শোভন। গভীর রাতের আকাশের দিকে তাকালে কি রকম একটা রোমাঞ্চ জাগে। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভয় হয়। মনে হয়, মহাশূন্যের মধ্যে খসে পড়বে বুঝি এই মুহূর্তেই। পৃথিবীটার অস্তিত্ব লোপ হয়ে আসছে মনের মধ্যে, পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে মাটি।

চোখ ফিরিয়ে নিল আকাশের গা থেকে। ঘনবুনন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কাল বিকেলের কথা মনে পড়ল।

বিনীতা বেড়াতে বেরিয়েছিল কাল তার সঙ্গে। রাক্ষুসিও ছিল। ধান রঙের রোদ মন্দিরের চূড়ার গা পিছলে অদৃশ্য হয়ে গেছে তখন। সেই গাঢ় রক্তাভ বিকেলে ওরা গিয়েছিল লংকার দিকে। বিনীতা অনেকদিন পরে এদিকে এল। রাস্তাগুলো এদিকে বেশ চওড়া চওড়া। লোক চলাচলও তুলনায় অনেক কম।

উচ্ছল হয়ে উঠেছিল বিনীতা, ছোট্ট মেয়ের মত।

শোভন বলল, সহস্র এক আরব্য রজনীর বন্দিনীর গর্দান যায় নি দেখেছি।

দুহাতে খোঁপাটা মেরামত করতে করতে বিনীতা তার জবাব দিল সূক্ষ্ম হেসে, আধুনিক বাদশাহীতে নতুন শাস্তি লেখে।

এর চেয়েও কি সেটা মারাত্মক ?

রাজ শক্তি বজ্রসুকঠিন, বুঝেছ ? বন্দিনীকে শয্যা-কোতলের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, মুণ্ডপাত করা হয়নি মাত্র।

কিন্তু ধর, নটে গাছ মুড়োয় নি, কথাও ফুরোয়নি তখন—পক্ষিরাজ আর তার সহিস এসে যখন পৌঁছল ?

রাজকন্যা তখন আর হাসল না।

কেন ?

তার চোখে যে জল এল তখন।

কিন্তু জল আসবার কোন সঙ্গত কারণ তো ছিল না, শোভন বললে।

ছিল না, বল কি ! রাজকন্যার তখন যে আর কোন আশা নেই।

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে চাপতে চাপতে শোভন একটু সময় নিয়ে বলল, পক্ষিরাজ ঘোড়া তাকে অনায়াসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত। সহিসের সাহসের অভাব হত না। সুতরাং আশা ছিল—

কিন্তু রাজকন্যা যে পক্ষিরাজ ঘোড়া বলে সেটার কোন প্রমাণ পায়নি কোন দিন।

সেটা কি করে হয়!—দাঁড়িয়ে পড়ে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করল শোভন।

খিলখিল করে হেসে উঠল বিনীতা, কিন্তু মশাই, পক্ষিরাজ ঘোড়া যদি তবে ল্যাজ নেই কেন?

বয়স্ক মুখভঙ্গী করে রাক্ষুসি হঠাৎ কথা বলল, মা তুমি হেচো না।

দাঁড়িটা পড়ল সেখানেই। দুজনে হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল কোন রকমে। থেমে গেল রূপক কথাবার্তা। বিনীতার হাসিটা তখনও কানের মধ্যে বাজছে। সাত বছর আগে একবার এমনি সন্ধ্যা-বেলা এই হাসি শুনেছিল। আজ এই হাসির মধ্যে চিড়খাওয়া একটা যন্ত্রণা অনুভব করল অকস্মাৎ।

লাল জুতো পরা পিঁপড়েপায়ে হাঁটছিল এতক্ষণ রাক্ষুসি। তাদের দুজনের মাঝখানে, একটা হ্রস্বরেখা হাইফেনের মত। মুখে অনর্গল এটা কি ওটা কি। তারই সব অদ্ভুত জবাবদিহি করতে করতে তার দু-পাশে দু-জন দুটি হাত ধরে ধীর তালে পা ফেলছিল। এখন আবার ব্যবচ্ছেদ ঘটাল সেই।

তারপর অন্ধকার নামতেই রাক্ষুসির চোখে ঘুমের কাঠির ছোঁয়া লেগে গেছে। ভেঙে পড়া খোঁপার মত বিনীতার বুকের ওপর এলিয়ে পড়েছে রাক্ষুসির মাথাটা। একটু জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে বিনীতা। বোধহয় হাঁপিয়ে পড়েছে।

একটা রিক্সা কিংবা টাঙ্গা করি?—শোভন বলেছিল।

না। এই বেশ লাগছে—বিনীতা জবাবে বলেছিল। এমনিভাবে অন্ধকারে কত দিন হাঁটিনি।

তবে ওকে আমার কোলে দাও, অনেকক্ষণ হেঁটেছ ওকে নিয়ে।

মৃদু আপত্তি তুলল বিনীতা কিন্তু শোভন শুনল না। ঘুমে গলে

গিয়েছে দুরন্ত মেয়েটা। সন্তর্পণে বিনীতার কাছ থেকে রাক্ষুসিকে নিতে গিয়ে শোভনের সমস্ত শরীর এক মুহূর্তের জন্যে অবশ হয়ে থেমে গেল। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল বিনীতা, শোভনের নিশ্বাসের সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেল। একটা ভিজে অন্ধকার এসে ঢেকে দিল তার চোখ, আকাশটা দুলে উঠল মাথার মধ্যে। পিপাসার নিষ্পেষণ ঘন হল ঠোঁটের ওপর। তার সজ্ঞান চেতনার বাইরে এক-মুহূর্তের মধ্যে কোথা দিয়ে যেন একটা ছোটখাট প্রলয় ঘটে গেল। এর আগে যা কখনও ঘটেনি।

তারপর নিজের কাঁধের ওপর রাক্ষুসিকে তুলে নিল শোভন। নিশ্বাস বন্ধ করে উথালপাথাল বুকে দাঁড়িয়ে রইল বিনীতা। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত।

পরে সমস্ত রাস্তাটা যদিও হেঁটেই এসেছে, কথা বলেনি কেউ। নিজেদের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে বাড়ি ফিরেছে তারা। এবং আজ আর বেরোয় নি। বিনীতা নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়েছে সহসা। কথায়-হাসিতে-ব্যবহারে সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে কাল রাতের পর থেকে। বরং লেখাকে অন্য দিনের চেয়ে বেশিবার সামনে পেয়েছে, সহজ হয়েছে তার ব্যবহার। মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ভালই লেগেছে শোভনের।

দ্বিতীয় সিগারেটটাও শেষ হয়ে গেল। জ্বলন্ত টুকরোটা গলিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল শোভন। শেষ প্রহরের চাঁদ উঠেছে ছাদের আড়ালে। অসংখ্য উঁচু নিচু ঘনপিনদ্ধ ছাদের রেখার ওপরে ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে একটা বিরাট কবরখানা নানা হরফের পাথরের স্মৃতিস্তূপ বুকে করে চাঁদের আলোর নিচে গুমরে গুমরে কাঁদছে। হঠাৎ কেন যেন করুণ লাগল সমস্ত পরিবেশটা।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রা নদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

মৃদুকণ্ঠে ছত্রকটি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে করতে নিচে নেমে গেল শোভন। আলো জ্বালল। ঘুম আসছে না কিছুতেই। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বেলে একটা বই পড়েছিল সন্ধে থেকে। মাথার ভিতরটা তাই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। শেষ রাতের বৃষ্টির মত যদি ঘুম নেমে আসে। আলো নিভিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিল শোভন। এবাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে, এক শোভন ছাড়া। কথার পরে কথা ভাবতে ভাবতে বেশি রাত হয়ে গেলে এই হয়।

জ্যোৎস্নার একটু আভা জানলা দিয়ে ঘরের দেওয়ালে এসে পড়েছে! সেই ছবিটার ওপরে আবার চোখ পড়ল। বিনীতার জলরঙের ছবি। শোভন এঁকেছিল একদিন। পুরো চেহারা ফোটেনি। খানিকটা আদল আছে মাত্র। বিনীতা ছবিটিকে বাঁধিয়েছিল এবং এখনও ধরে রেখেছে। কিন্তু ওই শুধু পটে লেখা ছবির আজ আর কী মূল্য আছে শোভনের কাছে।

টেবিলের ওপরে শোভনের নতুন কিনে আনা ইংরেজি বইগুলোর বার্নিশ জ্বলছে। চাঁদের ম্লান আলো তাদেরও স্পর্শ করেছে। লেখার কথা আবার মনে হল। কারণ চাঁদের আলোর মতই নিঃশব্দে তারও হাত এঘরের প্রতিটি আসবাব প্রতিটি জিনিস স্পর্শ করে। রোজ শোভনের অনুপস্থিতে এ ঘরে আসে লেখা। বিছানা থেকে শুরু করে বইয়ের টেবিল পর্যন্ত সুশৃঙ্খলায় তক্ তক্ করে। এক এক দিন আসবাবপত্রের জায়গা বদল করে নতুন চেহারায় সাজিয়ে দিয়ে যায় ঘরখানাকে। সত্যি এ ঘরের ওপরে লেখার অখণ্ড মনোযোগ।

কোন দিন কুঁজো থেকে জল গড়াতে গিয়ে এমন দেখেনি যে জল নেই। বরং ছু-বেলা টাটকা জল ভরা হয়েছে। আয়নার কাচ পরিষ্কার করা হয়েছে।

শোভনের অজ্ঞাতেই ব্যাপারগুলো ঘটত। সেদিন হঠাৎ জানতে পারল কে করে এইসব। শুধু জানা নয়, হাতে হাতে প্রমাণ পেল। সকাল বেলা স্নানের আগে সুধীরের ঘরে গিয়ে ঘণ্টা খানেক বসে শোভন। গল্প করে, পড়াশোনায় সাহায্য করে। ছেলেটির স্বভাবটা খুব ভাল। লাজুক বটে তবে শোভনের এই অযাচিত সাহায্যকে আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করে। সেদিন শোভন কি একটা রেফারেন্সের প্রয়োজনে একটা বই নিতে হঠাৎ নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল। ফিরে এসে প্রথমে ভেবেছিল বিনীতা। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে কি একটা বই খুলে দেখছে। পিছন থেকে ভুল করেছিল শোভন। বলেছিল, এটা তাহলে তোমারই কীর্তি, আমি এতদিন ধরতে পারিনি। কিন্তু আজ পালাবে কোথায়?

আজ ক-মাসের মধ্যে এবাড়ি থেকে এক পা বাইরে বেরোয়নি লেখা। সেই যে প্রথম দিন সে এসে এবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই থেকে। কোনও আত্মীয় স্বজন যে তার নেই বেনারসে তা বোঝা গিয়েছিল কিন্তু কোন পরিচিত পর্যন্ত কেউ নেই এতটা বিশ্বাস করতে কেমন যেন বেধেছে বিনীতার। তবু দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একটা চতুর্দিক বন্ধ বাড়ির মধ্যে এই বয়সের একটা মেয়ে কাটাবে ভাবতে কষ্ট হয়েছে তার। কতদিন বলেছে বিনীতা, যা একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয়। এভাবে থাকলে মরে যাবি যে।

লেখা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়েছে। এমন কি গঙ্গায় স্নান করতে কি মন্দিরের আরতি দেখতে যখন শ্রীনিবাসকে নিয়ে বেরিয়েছে বিনীতা তখন অনেক পীড়াপীড়ি করেও লেখাকে সঙ্গে নিতে পারেনি। কী একটা ভয় যেন তাকে বাইরে থেকে তাড়া করে এনে ফেলেছে বিনীতাদের বাড়ির মধ্যে। সেটা প্রাণভয় কিনা কে জানে। এতদিন বিনীতা ভাবত কোন একটা নিদারুণ শোকে বুঝি কেমন হয়ে গেছে কিন্তু এখন মাঝে মাঝে ভাবে হয়ত কোন একটা জটিল ব্যাপার আছে লেখাকে কেন্দ্র করে। যার ফলে সে এভাবে ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে।

সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছে বিনীতা। জানতে চেয়েছে অকপটে, যদি অবাঞ্ছিত কিছু ঘটে গিয়ে থাকে, যার জন্যে লেখা হয়ত সম্পূর্ণ দায়ী নয়। কিন্তু কোন কথাই বার করতে পারেনি। লেখা শুধু বলেছে, কী জানি বাইরে বেরোতে আমার কেমন যেন ভয় করে। মনে হয়, বাইরে বেরোলে আর বোধহয় ঘরে ফিরতে পারব না।

বিনীতা আর কিছু বলেনি। কিন্তু তার মনে এই ধারণা শেষ পর্যন্ত দৃঢ়মূল হয়েছে যে লেখার কিছুটা মাথার গোলমাল হয়েছে। কাজে বহাল হবার পর থেকে বেশ কয়েকবার লেখা গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মূর্ছা গিয়েছে। স্মেলিং সল্ট আর জলের ঝাপটায় তারপর আবার জ্ঞান ফিরে এসেছে অবশ্য। শেষদিকে ইদানীং এই রোগটা আর দেখা দেয়নি। লেখার আড়ষ্টতা অনেকটা কেটে গেছে। কথাবার্তা আগের চেয়ে বেশি বলে, গল্প করে, হাসেও। এবং সেই থেকে তার শরীরেরও কিছু উন্নতি হয়েছে। এসেছিল ভিজে পাখির মত রুগ্ন চেহারা নিয়ে, এখন সে চেহারা ফিরে গেছে। আগের মত থমথমে মনও অবশ্য আর নেই। তবু এই ভয়ের কোন মানে হয় না। মনে হয় বাইরে বেরোলে আর বোধহয় ঘরে ফিরে আসতে পারবে না—কোন মানে হয় এসব বাজে ভাবনার? বিনীতা বুঝল লেখার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই মস্তিষ্ক বিকৃতির মূলে নিশ্চয়ই কোন এক বড় রকমের দুর্ঘটনা আছে। সেইটে আবিষ্কার করতে হবে। নইলে লেখার চিকিৎসাও সম্ভব নয়। কিন্তু লেখা যদি না বলে বিনীতা কি করতে পারে।

লেখাও ভেবেছে পরিস্থিতিটা। বলে হাল্কা হতে চেয়েছে অনেকবার কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বাভাবিক বুদ্ধি এসে বাধা দিয়েছে। অনেক ঠেকে নিজের ভালমন্দটুকু অন্তত বুঝতে শিখেছে লেখা। জেনেছে পৃথিবীতে সত্য কথার ঠাঁই নেই সব জায়গায়। অপ্রিয় সত্য, অপ্রীতিকর ব্যাপারই ঘটায় অধিকাংশ সময়। যে আশ্রয় সে অভাবিত ভাবে পেয়ে গেছে সে আশ্রয় সে আর হারাতে রাজি নয়। এবং এটা হারালে এমন কোন পথ তার আর জানা নেই, এমন কোন দ্বিতীয় সংস্থান তার আয়ত্তে নেই যে, বাকি দিনগুলো তার সুখে-দুঃখে গড়িয়ে যাবে কোন রকমে। আসলে সেই ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়েই এই অবস্থাটা হয়।

বিনীতা তার বড় বোনের মত। আশ্রয় দিয়েছ, স্নেহ দিয়েছে,

এমন কি আশ্বাসও দিয়েছে। এমন কথাও একদিন বলে ফেলেছে যে, সে যতদিন আছে লেখার অন্তত খাওয়া-পরা-থাকার ভাবনা নেই। ভাববার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা কথা লেখা ভাল করেই জানে যে, বিনীতা সত্যি করে তার কেউ নয়, না বন্ধুত্ব না রক্তের সম্পর্ক, কোন যোগসূত্রেই তার সঙ্গে বাঁধা নয় লেখা। বরং মুনীব-ভৃত্য সম্পর্কই প্রচ্ছন্ন ভাবে সত্য। শ্রম এবং পারিশ্রমিক ছাড়া আইনত তাদের যোগাযোগের অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং বুদ্ধিমতী লেখা সেই মাত্রা বজায় রেখেই চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। তাই বিনীতার ধমককে সে ভয় করেনা ততটা যতটা তার স্নেহাতিশয্য, তার সখীসুলভ ব্যবহারকে করে।

তাই সব কথা কিছুতেই বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি লেখার। লেখার সেটা স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। যদি অপরাধ আদৌ হয়, তবে তা আত্মরক্ষার জন্য স্বাভাবিক সাবধানতা মাত্র। তাছাড়া, মেয়ে হয়ে নিজের জীবনের চরম কলঙ্ক আর ব্যর্থতার কথা নিজে মুখে বলেই বা কি করে। ভয়ের সঙ্গে লজ্জাও মিশে আছে যে। সব শুনে হয়ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে বিনীতা, নয়ত এতদিন লুকোচুরি খেলার অপরাধে দূর করে দেবে বাড়ি থেকে। সুতরাং মনে মনে ক্লান্ত হলেও নিজের কাহিনীর বোঝা নিজেকেই বহন করে বেড়াতে হবে দিনের পর দিন। আর ভয়ে ভয়ে প্রহর কাটাতে হবে এই বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই বুঝি জানাজানি হয়ে যায় সব!

কোন জিনিসটা যদি নিজের জায়গার থাকে! এই সকালে গুছিয়ে দিয়ে গেল লেখা, সন্ধে নাগাদ এসে নিজেই চমকে যাবে। সমস্ত ঘরটা যেন ভূমিকম্পের পর শান্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটা জিনিস নিজের জায়গা বদল করে বসে রয়েছে। বিছানার

চাদরটাকে হয়ত খুঁজতে খুঁজতে জামাকাপড়ের আলনা থেকে পাওয়া যাবে। টেবিলের বইগুলো ইতস্তত ছড়ানো। ইজিচেয়ারের ওপরে হয়ত একখানা পাতাখোলা অবস্থায় উপুড় করা রয়েছে, একখানা বালিশের তলায়। দাড়ি কামানোর আয়নাটাকে দাঁড় করাতে কতকগুলো সারি দিয়ে রাখা হয়েছে। তোয়ালেটা পড়ে আছে ঘরের কোণায় জুতোর বুরুসের পাশে। সিগারেটের টুকরোগুলোর কথাই নেই। এলোপাথারি ছুঁড়েছেন ভদ্রলোক যখন যেদিকে খুশি। আরও কত বলবে!

তবু এ ঘর গুছোতে এসে কেমন যেন খুশি খুশি লাগে লেখার। আগে আগে বিরক্ত হত কিন্তু ইদানীং একটা মায়া পড়ে গেছে। বরং অন্য কেউ যদি এঘরে হাত দিতে আসে মনে মনে ক্ষুণ্ণই হবে হয়ত। একঘেয়ে কাজের মধ্যে এই ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার ব্যাপারে যেন কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ পায়। প্রতিদিনই একটা করে ছোটখাট বিস্ময় যেন লুকিয়ে থাকে এঘরের প্রত্যেকটা জিনিসকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে। সব ফিরে পেয়ে আবার সেগুলোকে নতুন চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে লেখার নিজের রুচি এবং রসবোধ যেন মুক্তি পায়।

লোকটা যা উচ্ছৃঙ্খল, কোন কিছুর হিসেব রাখে না। হাতের কাছে যা পায় ব্যবহার করে। কাজ মিটলে যেখানে খুশি ছড়িয়ে ফেলে রাখে। পরে যে আবার সেটার প্রয়োজন হবে, নিজেকেই খুঁজতে হবে, তা মনে থাকে না। কৌতুক বোধহয় শোভনবাবুর ব্যবহার করা জিনিসপত্রের বিপর্যস্ত দুর্দশা দেখে। লোকটা হয় অতিমাত্রায় ছেলেমানুষ, নয়ত বেহিসেবি কুঁড়ের বাদশা, চিরকাল পরের হাতের সেবা খেয়ে এসেছে।

কিন্তু কথাবার্তা শুনলে এমন অসাবধানী, অন্যমনস্ক মনে হয়না। বিনীতাদির সঙ্গে কি সুধীরের সঙ্গে যখন কথা বলেন, আসতে যেতে তার অনেক কথাই লেখার কানে যায়।

তখন কি জানি কেন কমলের কথা মনে পড়ে যায়। কিছু মিল আছে হয়ত কমলের কথা বলার ভঙ্গীর সঙ্গে এবং অনেকটাই হয়ত নেই, তবু কোন পুরুষের কথা চোখ বুজে ভাবতে গেলে কমল ছাড়া আর কারও মুখ ভেসে ওঠেনা। যদিও শোভনবাবু যথেষ্ট গম্ভীর, খুব হাল্কা গলায় কথা বলেন না, তবু তাঁর কথা বলার ধরণধারণের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে যা টেনে রাখে সকলের মনকে। এই ক্ষমতাটা কমলের মধ্যেও ছিল, ছিলনা শুধু এই চেহারা, এই গাম্ভীর্য। শোভনবাবুর সঙ্গে কমলের কোনক্রমেই তুলনা হয় না। তবুও সেই লোকটিকেই মনে পড়ে যায় লেখার, যে ধূমকেতুর মত তার জীবনে এসেছিল।

অনেক করে ভেবে দেখবার চেষ্টা করল লেখা কিন্তু যতবার ভাবল ততবারই মনে হল কমলের ওপরে তার কোন অভিযোগ নেই। যে তার সমস্ত জীবনটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়ে গেছে, যে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে, তাকেও মনে মনে কখন ক্ষমা করে ফেলেছে লেখা।

অথচ সেই ভয়ঙ্কর দিনটাকেই কি কোন দিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে লেখা? বেনারসের সেই প্রথম দিনটি যেন তার জীবনে আগাম পাওয়া একটা মৃত্যুদিন কিন্তু মৃত্যুর চেহারাও যেন দ্বিতীয়বার অমন ভয়ঙ্কর না হয়। ছোট টুলটার ওপরে বসে পড়ে যেন বিগতদিনের একটা দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল লেখা। বাইরের চেতনা ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে এল। হঠাৎ চারপাশ মেঘে ঢেকে এলে যেমন একটা স্তিমিত আলোয় অস্পষ্ট হয়ে আসে ঘরের ভেতর, লেখার মনের ভেতরটা সেই রকমই আবছায়া হয়ে এল।

সেদিনের গঙ্গার চেহারাটা আজও মনের মধ্যে গেঁথে আছে। চাইনিজ ইংকের একটা মোটা টানের মত। মাঝ-কার্তিকের সন্ধ্যা। কুয়াশায় বড় তাড়াতাড়ি আবছা হয়ে আসে। সন্ধের কিছু আগে থেকেই বসেছিল লেখা। ক্ষিধেয় পিপাসায় অবসন্ন

শরীর। দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছে মন। কাল রাত জাগা গেছে, ট্রেনের ধকল, অনাহার সব মিলিয়ে একটা অবসাদ ছিলই, তার ওপরে এ মানসিক আঘাতটা।

সকালে নেমেছিল বেনারসে এসে। তখন অতটা অসহায় বোধ করেনি নিজেকে। কারণ কমল সঙ্গে ছিল। যদিও কমলের শুকনো বিষণ্ণ থমথমে চেহারাটা খুব স্বস্তি জাগায়নি মনের মধ্যে তবু যখন ধর্মশালায় মালপত্র নিয়ে উঠেছে তখন নতুন জীবনের স্বপ্ন উঁকি দিয়েছে বারবার। পথে আসতে সারারাস্তা মনে মনে বিশ্বনাথের পায়ে মাথা খুঁড়ে যে প্রার্থনা করেছে, মনে হয়েছিল, তা বুঝি সফল হতে চলেছে।

ধর্মশালায় ওঠার পর জলটুকুও গ্রহণ করেনি লেখা। স্নান সেরে পুজো দিতে গিয়েছে বিশ্বনাথের মন্দিরে। সঙ্গে ছিল কমল। বাধা দেয়নি লেখার কোন প্রস্তাবে। মুখ বুজে শুধু সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। সেই প্রায় ভরদুপুর বেলায় লেখার মাথার মধ্যে মাঝে মাঝে কেমন করছিল। কাল থেকে খাওয়া হয়নি। ট্রেনে খাবার কিনেছে কমল কিন্তু তার এককণা মুখে ছোঁয়ায়নি লেখা। ঝাপসা চোখে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে জানলার কাচের ওপর ঠোঁট চেপে বসে ছিল। বাইরে ছুটন্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের এক একটা স্ফুলিঙ্গের মত মধ্যরাতের শেষরাতের আলোজ্বালা স্টেশনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে শীত আর অন্ধকার যেন হাত ধরাধরি করে ছুটে চলছিল।

গত রাত্রির অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তা এবং অনাহার তার দুর্বল শরীরকে আরও কাহিল করে দিয়েছিল। বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকে শরীরের মধ্যে একটা অস্থির যন্ত্রণা মাঝে মাঝে মোচড় দিচ্ছিল। কিন্তু মুখে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ফুটতে দেয় নি লেখা। নইলে কমল তো সারাক্ষণই প্রায় মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, একবারও কি আর কিছু বলত না।

তারপর পুজো দিয়েছে মন্দিরে গিয়ে। কমল বাইরে অপেক্ষা করেছে। কায়মনবাক্যে নিজের মনের শেষ প্রার্থনাকে পাথরের দেবতার কাছে নিবেদন করে দিয়ে প্রায় টলতে টলতে যখন বেরিয়ে এসেছে তখনও কল্পনা করেনি বাইরে তার জন্যে কি অপেক্ষা করে আছে। কমলকে খুঁজতে খুঁজতে ফুলবালীর দোকান পর্যন্ত এগিয়ে এসেই প্রথমে নজরে পড়ল তার জুতোর পাশে নিউকাট জোড়া নেই। মাথাটা ঘুরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নিজেকে অসম্ভব রকম অসহায় আর নিঃসঙ্গ মনে হল।

কৌতূহল আর অনুকম্পা মেশা চোখে ফুলবালী তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়লো। নিশ্চয়ই মুখ-চোখের অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, একনজরেই বুঝে নিয়েছে ও লেখার দুর্দশা। অথবা কমলকে পালিয়ে যেতে দেখেছে ও। পালিয়ে যাচ্ছে কমল, কি করে বুঝল? ওদের অভ্যস্ত চোখ, হালচাল দেখলেই পেটের খবর টের পেয়ে যায়। কমল পালিয়ে গেছে একথাটা একমুহূর্তে তার মনের মধ্যে আর্তনাদ করে উঠেছে। এর জন্যে যুক্তি তর্কের প্রমাণ-সাক্ষ্যের অপেক্ষা থাকে না, মেয়েরা বাতাসেও নিজের বিপদের সংবাদ পায়।

লেখা জুতো জোড়া অদৃশ্য হয়েছে দেখেই বুঝে নিয়েছিল ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই আশা রাখতে হয়। জীবনের ধর্মই এই। মরবার আগে শেষ পর্যন্ত জীবনের জন্যে জ্বলতে চায়, নিতেল সলতের মত। লেখা এই সম্পূর্ণ অপরিচিত শহরে, আত্মীয় বন্ধুহীন রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন একেবারে নিঃস্ব—ফতুর হয়ে গেল, তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ল না।

শুধু লোক জমতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি বিশ্বনাথের গলিটা পেরিয়ে এল। তারপর অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে সেই অচেনা বিসর্পিল রাস্তাগুলো ঘুরে বেড়ালো। খোঁজা অর্থহীন জেনেও ইতস্তত পাগলের মত হেঁটে হেঁটে নিজেকে ক্ষয় করল। অবশেষে

পথ শুধিয়ে শুধিয়ে ধর্মশালায় ফিরে এল যখন তখন প্রায় বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। শীতরাত্রির আভাস দেখা দিয়েছে রোদ-মোছা আকাশে। কিন্তু কমল তো আর তাকে ধরা দেবার জন্যে সেখানে বসে নেই। মালপত্র নিয়ে সে আবার সরে পড়েছে। ম্যানেজার কুটিল সন্দেহে তাকাল তার দিকে। দু-একজন অনুকম্পার দৃষ্টিতে। ব্যাপারটা বুঝতে বাকি নেই। বেনারসে এ ঘটনা তো নিত্যই ঘটছে। হয় কান্না আর অভিযোগ, নয় পুলিশ এসে হানা দেয়। অভিভাবকরা এসে ঘেরাও করে দাঁড়ায় সদলবলে কখনও বা। লেখার ক্ষেত্রে এর কোনটাই ঘটেনি। আর এক মুহূর্তও সে সেখানে দৃশ্যরচনা করে দাঁড়িয়ে থাকেনি। আত্মবিলাপ শোনায় নি কাউকে চোখের জলে ভেসে।

বিনামেঘে বজ্রঘাত হলেও এই আকস্মিক আঘাত সে মাথা পেতেই নিয়েছিল। তার আত্মসম্মানবোধ কারও চেয়ে কম ছিল না। নিজেকে একবার ভুলে ভুলে সস্তা করে ফেলেছিল বটে কিন্তু বারবার সে ঘটনা ঘটবে কেন। নিদারুণ অভিমান, ঘৃণা আর হতাশায় সে শেষ রাস্তাটিই বেছে নিয়েছিল, যেটি তার মত মেয়ের পক্ষে হাত বাড়ালেই পাওয়া সম্ভব। যার জন্যে খোসামোদের প্রয়োজন হয় না, সম্ভ্রম খোয়াতে হয় না।

আঁচলে একটা পয়সা ছিল না লেখার। সেই শীতের সন্ধ্যার মুখে মুখে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছেছিল ধীরে ধীরে। আর তাড়া নেই। মন স্থির করে ফেলেছে কোন পথে যাবে। কিন্তু তবু অপেক্ষার প্রয়োজন আছে। ঘরে যার ফেরবার রাস্তা নেই তাকেও পথের ধারে অপেক্ষা করতে হয় এই যা দুঃখ। লেখা অবশ্য অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মাঝ-কার্তিকের সন্ধে। অন্ধকার ঘন হয়ে আসতে বিলম্ব হয় নি। কুয়াশা না মেঘ আঠার মত আকাশ লেপে দিল। কালি গোলা দিগন্তের মধ্যে কখন ডুবে গেল গঙ্গার স্রোতস্বিনী চেহারা।

দূরে দূরে এক-আধটা আলো জ্বলে উঠেছে কিন্তু তার আভা এতদূরে পৌঁছায় না। চোখে আর কান্না ছিল না লেখার, অনেক কেঁদেছে সারাদিন সারাবেলা। সমস্ত অনুভূতিগুলো তিল তিল করে এক অতিচেতন চৈতন্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। নির্জলা চোখে ঠোঁটে দাঁত চেপে ক্রমশ জলের দিকে এগিয়ে চলতে থাকল লেখা। সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে।

আশে পাশে কেউ নেই। ঘাটের বড় বড় ছত্রগুলো নির্জন, নিষ্প্রদীপ। এই শীতে জলের ধারে সন্ধেবেলা কে থাকবে। লেখার মত ক-জনের প্রয়োজন। ভাগবত পাঠ, কথকতা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে। আর বায়ুসেবীরাও কিছু হিমসেবী নয়, তারাও চম্পট দিয়েছে।

একবার শেষবারের মত চারপাশ তাকিয়ে নিল ভাল করে। কারণ খাড়াইয়ের প্রান্তে পৌঁছে গেছে লেখা। উঁচু চত্বরের কিনার স্পর্শ করছে পায়ে। নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত ক্ষুধার্ত জলস্রোত একটু নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সাপের গায়ের মত ঠাণ্ডা পিচ্ছিল অমোঘ মৃত্যুকে অনুভব করল মনে মনে। শুধু এক লহমার অপেক্ষা! দূর শৈশবের বিস্মৃত প্রায় মাকে মনে পড়ল চকিতে। মা যেন তাকে ডাকছে, ঝাঁপিয়ে পড়তে বলছে দু-হাত বাড়িয়ে। তার সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত যন্ত্রণা তিনি ভুলিয়ে দেবেন এক নিমেষে।

চোখবুজে লাফ দিতে গেল লেখা কিন্তু সমস্ত শরীর চমকে অসাড় হয়ে গেল পর মুহূর্তে। কে যেন প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরেছে পিছন থেকে। একেই কি স্মৃতি বলে, একেই কি বলে মৃত্যুভয়। না। এ তো আর একটা রক্ত মাংসের শরীর। উষ্ণ নিশ্বাস আর হৃদস্পন্দন মিলিয়ে একটি আস্ত মানুষ।

ভয়ে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে লেখা চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরল ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা চোখে-মুখে লাগতে। চোখ

মেলতে প্রথমে নজর পড়ল সারিসারি আকাশপ্রদীপ জ্বলছে ঘাটের ওপর বাঁশের আগায়। বাবুইয়ের বাসার মত এক একটা চুবড়ি, প্রদীপ রয়েছে তার মধ্যে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে বেশ দেখায়। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল। মনে পড়ল নিজের অবস্থা। ঠাণ্ডা জলে মুখ-বুক ভিজে গিয়েছিল। জোলো হাওয়ায় শীত শীত লাগছে।

মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল একটা মুখ। এখন কেমন বোধ করছ মা?

গলার স্বর একজন প্রৌঢ়া মহিলার। লেখার মাথাটা তিনিই কোলে তুলে নিয়ে বসেছিলেন। তাঁর স্নেহ কোমল গলার মা-ডাক শুনে লেখার সমস্ত অন্তরটা কেঁদে উঠল।

আপনি কে?

কেউ না মা, কেউ না। এখন তুমি কেমন আছ বল তো।

ধীরে ধীরে নিজের চেষ্টায় উঠে বসল লেখা। তারপর অন্ধকারেই ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করলেন কেন, আমি তো আপনাকে চিনি না।

ছি মা! অমন কথা মুখে আনতে নেই। তুমি যা করতে যাচ্ছিলে—

আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও তাই করতেন। আমাকে আবারও তাই করতে হবে···মাঝ থেকে আমাকে এভাবে বাঁচাতে এলেন কেন আপনি।

লেখার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ লক্ষ্য করে ভদ্রমহিলা বললেন, ছিঃ মা, কাঁদতে নেই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ। তুমি এই তীর্থস্থানে এসে—

অনেকক্ষণ লেখা কোন কথা বলল না। কথাটা তার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কোন উপায় ছিল না আমার। কোন উপায় নেই—

উদ্দেশ্যহীনভাবে কয়েক-পা চলেছে এমন সময় প্রৌঢ়া এসে আবার

তার হাত ধরলেন, আছে বৈকি মা। সবই তাঁর ইচ্ছে।—একটা হাত মাথার সঙ্গে ঠেকিয়ে বললেন—এস আমার সঙ্গে, এই বুড়ীমা থাকতে তোমার ভয় কি? চল আমার বাড়িতে।

কিছু ভাববার অবকাশ দিলেন না। হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। লেখা বার দুয়েক অনেক কষ্টে বলতে গেল, আপনি বুঝতে পারছেন না, আমাকে নিয়ে আপনি ভাল করছেন না! আমি অশুচি—আমি পাপ করেছি, অন্যায় করেছি, আমার বাঁচার অধিকার নেই, কেউ বাঁচাতে পারবে না, আপনিও না। সব জানতে পারলে আপনি ভীষণ আঘাত পাবেন, মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আমার প্রায়শ্চিত্তই একমাত্র পথ—

কিন্তু শুধুই গলার কাছে দুর্বোধ্য বাষ্প ফেনিয়ে উঠল, স্বর ফুটলেও কথা ফুটল না। প্রৌঢ়া বললেন, এখন থাক মা, সব শুনবো। পরে শুনবো।

তারপর অনেক আলো-ছায়ায় ভরা জটিল আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু গলিপথ, তস্য গলিপথ পেরিয়ে একটা ছোট্ট মান্ধাতার আমলের পোড়ো দোতলা বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে এসে দু-জনে দাঁড়াল। প্রথমে পোড়ো মনে হয়েছিল বাইরে থেকে, ভেতরে ঢুকে ধারণা বদলাল।

প্রৌঢ়া কড়া নাড়তেই খুলে গেল দরজা। একটি অল্প বয়সী বিধবা মেয়ে লণ্ঠন হাতে দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল।

এস এস মা, ভেতরে এস।

প্রৌঢ়া পথ করে দিয়ে লেখাকে ডাকলেন। মেয়েটি এতক্ষণে তাকে দেখতে পেল।

এ কে বুড়ীমা?

ওপাশের স্বল্পালোকিত বারান্দা থেকে খিলখিল করে কারা হেসে উঠল: নতুন বুঝি!

প্রৌঢ়া তাদের উদ্দেশ্যে একবার ভ্রূকুটি করে লেখাকে মিষ্টি

গলায় ডাকলেন, তুমি এস। লেখা তখন প্রায় মুমূর্ষু। পরিবেশটা বুঝে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভদ্রমহিলার পিছু পিছু দোতলায় তাঁর ঘরে গেল লেখা। তাকে বিছানার ওপরে বসিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেম।

ঘরের মেঝেয় একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। তার আলোয় ঘরের চার পাশটা দেখল লেখা। নোনাধরা দেওয়াল। অনেক দেবদেবীর পট ভিড় করে আছে। ঘাটের ছবি, মন্দিরের ছবিও আছে। ঘরের এক কোণে একটা ত্রিশূল, একটা কমণ্ডলু, দেওয়ালে পেরেকে ঝুলছে একটা বড় রুদ্রাক্ষের মালা। অন্যদিকে কয়েকটা ছোট বড় তোরঙ্গ। পিছন দিকে ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল বিরাট এক-খানা আয়না। সোনালী জলের কাজ করা ফ্রেম। এখন প্রায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু আয়নাখানা বেশ দামী বলে মনে হয়। এ-ঘরের সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে বেমানান।

আয়নায় ছায়া পড়ল মহিলাটির। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছেন, হাতে একটা কাঁসার গ্লাস। ঘুরে বসল লেখা। এতক্ষণ পরে তার প্রাণকর্ত্রীর চেহারা স্পষ্ট করে দেখল। ফর্সা রঙ। ছিমছাম চেহারা, পরনে সাদা থান। মাথায় অল্প ঘোমটা টানা। তার নিচে চিকচিক করছে কালো চুলের পরিপাটি সিঁথি। পাতা কেটেছেন কানের পাশে। নাকের ওপরে একটা স্পষ্ট চোখে পড়বার মত বড় তিল। ঠোঁট লাল, পান খেয়েছেন।

মুখের দিকে কি দেখছ মা, দুধটা খেয়ে ফেল দিকি ?

ইতস্তত করে দুধটা শেষ পর্যন্ত খেয়ে নিল লেখা। প্রায় ঠাণ্ডা হিমহয়ে যাওয়া শরীরে আবার যেন রক্তস্রোত চলাচল শুরু হল গরম দুধ খেয়ে। ভীষণ ঘুম পেল লেখার। এতক্ষণ যে ঘুমকে সে খেয়ালই করেনি। হাই তুলল বার দুই। চোখের পাতা ভারি হয়ে নেমে আসতে লাগল।

শুয়ে পড় এই বিছানাতেই। এখন তোমার ঘুমোন দরকার।

সেদিন ওই পর্যন্তই। তারপর দিনে-দিনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। বুঝতে পারল ফাঁদে পড়েছে সে। মিষ্টি কথায় সুন্দর ব্যবহারে ভুলে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে সে। এ সর্বনাশের চেহারা অন্যরকম। নরকের দরজায় পৌঁছে যেন শিউরে উঠল লেখা। এবার তাকে তিল তিল করে কদর্যতার পাঁকের মধ্যে ডুবতে হবে। রেহাই নেই। রেহাই থাকলে তার মত আরও যে ক-টি হতভাগ্যের দল এবাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে তারাও পড়ে থাকত না। প্রথম রাতে যে মেয়েটি দরজা খুলেছিল তার নাম গীতা। সেই চুপিচুপি এবাড়ির রহস্য প্রকাশ করেছে তার কাছে। জীবিকা নয়, এই ঘৃণিত উপ-জীবিকার পদ্ধতি শুনে শিউরে উঠেছে লেখা। গীতা চোখের জল মুছে নিজের গায়ের জামা খুলে পিঠের চেহারাটা দেখিয়েছে। কথা না শুনে চলার শাস্তি। দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে লেখার।

ডুবে যার মরা হলনা তার কি শেষে এই অপমৃত্যু ছিল কপালে। অনেক ভেবে ভেবে কিছু কালের মত বাঁচবার একটা উপায় বার করল লেখা। বুড়ীমাকে নিজের প্রকৃত অবস্থা জানাল ভয়ে ভয়ে। কিন্তু তার ফল ফলল অন্যরকম।

মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। টুল থেকে উঠে পড়ল লেখা। কতক্ষণ এঘরে এসেছে মনে নেই। অন্ধকার হয়ে এসেছে বাইরে। সিঁড়ির মুখে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। আবার সেই পুরনো রোগটা জেগে উঠল বুঝি। মাথার ভেতর কেমন করছে। পেটের মধ্যে সেই অকথ্য যন্ত্রণাটা যেন সাপের মত মোচড়াচ্ছে। গুলিয়ে উঠছে গা। মাটিতে ঠিক মত পা পড়ছে না বলে মনে হচ্ছে। ভূমিকম্পের সময় ঠিক যেমন হয়।

নিচে থেকে কে যেন ডাকল লেখা বলে। বিনীতাদি হবে। গলার স্বরটা কেমন রুক্ষ রুক্ষ। উত্তর দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু

সে ক্ষমতা যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। দোদুল্যমান পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে হঠাৎ ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল লেখা। বুড়ী-মা ওপরে উঠে আসছে জ্বলন্ত চোখে। শেষ পর্যন্ত তাহলে তাকে খুঁজে বার করলই। প্রাণভয়ে লেখা ঘুরে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে ছুটতে গেল কিন্তু পা হড়কে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অবধারিত মৃত্যুকেই স্মরণ করেছিল সেই আধ-আলো আধ-ছায়া ভরা সিঁড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে। হাতের সামনে কোন অবলম্বন ছিল না যা সে আঁকড়ে ধরতে পারে। দেয়ালের সঙ্গে মাথাটা ঠুকে গেল প্রচণ্ড জোরে, চোখের ওপরে কালো পর্দা নেমে আসতে লাগল ধীরে ধীরে জলের ঢেউয়ের মত। তারপর বুড়ীমার দুটি হাতের মধ্যেই যেন এলিয়ে পড়ল তার দেহটা আবার। স্তিমিত চৈতন্য দিয়ে শেষবারের মত অনুমান করল লেখা।

আট

এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা আশা করেনি শোভন। বলতে গেলে প্রস্তুতও ছিল না মুহূর্ত আগে। চশমাটা ভুলে ফেলে গিয়েছিল ঘরে। তাই ফিরে এসেছিল অসময়ে। বিনীতা কলঘরে ঢুকেছে। শ্রীনিবাসও বাড়ি নেই। রাক্ষুসিকে নিয়ে ঘাটের দিকে বেড়াতে গেছে বোধহয়। নিচে থেকেই চেঁচিয়ে বার দুই লেখাকে ডাকল শোভন। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। অগত্যা নিজেই তেতলার দিকে উঠছিল। উঠছিল দ্রুত পায়ে, আপন মনে। আবছা অন্ধকারে সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে! প্রস্তুত ছিলনা তাই এমনতর ঘটনার জন্যে।

একমুহূর্ত সময় পায়নি ব্যাপারখানা বুঝে ওঠবার। একটা শব্দ শুনেই তাকিয়ে দেখে কে যেন তাল গোল পাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ব্যবধান ছিল না বেশি। হাত বাড়িয়ে ক্ষিপ্র-গতিতে ধরে ফেলল দেহটাকে। আর একটু হলে সামলাতে পারত না, ধাক্কা খেয়ে নিজেও গড়িয়ে পড়ত পাথরের সিঁড়ির নিচের ধাপে।

আঘাতটা সামলে নিয়ে শোভন দেখল লেখার সংজ্ঞাহীন দেহটাকেই সে ধরে আছে। অনড় ভারি দেহটা কোন রকমে টেনে তুলল ওপরে। তারপরে ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় সাবধানে শুইয়ে দিল শোভন। কপালটা কেটে গেছে এতক্ষণে লক্ষ্য করল। রক্ত পড়ছে দরদর ধারায়। নিশ্বাস পড়ছে ক্ষীণ প্রবাহে। মুখ জুড়ে একটা আতঙ্কের ছাপ।

বুকের কাছে কান পেতে শুনল হৃদপিণ্ডের গতি। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে ক্ষত জায়গাটায় কোন রকম করে

একটা বাঁধন দিল। বিস্রস্ত কাপড়টা ঠিক করে দিয়ে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে গেল।

সুধীর আর বিনীতাকে পেয়ে গেল দোতলার সিঁড়ির মুখে। শব্দ শুনতে পেয়ে তারাও এদিকেই আসছিল।

শোভন সুধীরকে লক্ষ্য করে বলল, চটকরে সাইকেলটা নিয়ে ধর্মশালায় চলে যাও তো সুধীর। ওখানকার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন আমার নাম করে। বলবে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গিয়েছে একজনের। যাও, যাবে কি আসবে।

সুধীর দৌড়ল। বিনীতা বলল কী ব্যাপার, কে পড়ে গেল? রাক্ষুসি নাকি?

ভয়ের কিছু নেই। এস আমার সঙ্গে। লেখা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে! শোভনের পিছন পিছন দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বিনীতা বলল, তবে যে বললে মাথা ফেটে গিয়েছে।

যথাসাধ্য সহজ গলায় শোভন বললে, হ্যাঁ, মাথাটাও অবশ্য একটু কেটে গিয়েছে।

বল কি! হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিনীতা, এইত, ইস্! এত রক্ত পড়েছে।

ডাক্তার এলেন একটু পরে। রোগিনীকে দেখে তাঁর মুখ অন্ধকার হল। বিনীতা-শোভন-সুধীর সকলেই শুকনো মুখে ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে, উঠে পড়লেন তিনি। বললেন ভয়ের কিছু নেই, আধঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে। শোভনবাবু আসুন আমার সঙ্গে।

ভিজিটের টাকা নিলেন না ডাক্তার। রাস্তায় বেরিয়ে শোভনের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এ আপনার কে হয় শোভনবাবু। মানে, এই পেশেন্টের কথা বলছি।

শোভন বলল, আমার কেউ না। এই বাড়িতে থাকে।

কতদিন থেকে এ-বাড়িতে আছে মেয়েটি? ভ্রূভঙ্গী করে ডাক্তার জানতে চাইলেন।

এত কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন, শঙ্করবাবু? আপনি চেনেন নাকি ওকে?

একটা বিচিত্র বর্ণের হাসি ফুটে উঠল ডাক্তারের ঠোঁটে। চিনি মানে! হাড়ে হাড়ে চিনি। আমার পেশেন্ট ছিল যে একদিন।

আপনার পেশেন্ট ছিল লেখা? অবাক হয়ে শোভন বলল।

বাঁ-চোখটা ছোট করে কুৎসিত মুখে ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ পেশেন্ট! ডবল ভিজিটের পেশেন্ট! কেসটা খুব খারাপ ছিল কিনা!

শোভনের প্রায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। প্রতিবার পেশেন্ট শব্দটার ওপরে এমন ভাবে অ্যাকসেণ্ট দিচ্ছিলেন যে কদর্য শোনাচ্ছিল কথাটা।

কি যা-তা বলছেন মশাই। ওভাবে কথা বলেন কেন?

আরক্ত চোখে একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে আবার হেসে বললেন, আমার এক পুরনো ক্লায়েণ্টের বাড়ি থেকে মেয়েটি আজ ক-মাস হল পালিয়ে এসেছে। ডেঞ্জারাস টাইপের মেয়েছেলে মশাই, সাবধান হবেন।

আচ্ছা, আপনি এবার যেতে পারেন ডাক্তারবাবু, আমি বাড়ি ফিরব।

প্রত্যেকেই এক একটি চরিত্র। যেমন এই বেনারস, তেমনই এই বেনারসের মানুষ। মানুষগুলি সবাই বেনারসের নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রত্যেকেই ভূগোলের এই ছোট্ট একটা বিন্দুর মধ্যে এসে মিলেছে। ঘড়ির কাঁটার মত একটি নির্দিষ্ট তালমাত্রায় তারা সবাই যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

শিকদার, মুরলীধর থেকে শুরু করে কুমারভট্ট ক্যাঙ্গারু সাহেব, কিংবা ধর্মশালার ম্যানেজার থেকে খালাসি ডাক্তার শঙ্কর মিত্তির পর্যন্ত এক একটি বহুরূপী।

একরঙা চরিত্র কোনটিই নয়, সামনে একরকম মুখ, পিছনে আর একরকম। আলো পড়লে যেমন দেখায়, অন্ধকারে ঠিক তেমনটি দেখায় না। দাবার ছকের সামনে স্পঞ্জের মুখ নিয়ে যে ডাক্তার বকের মত নিমগ্ন চিত্তে বসে থাকেন, তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের কথা জানতে পারলে আঁতকে উঠতে হয়। কুমার ভট্টের মুখখানা ক্লোজআপে যদি ধরা পড়ে কোন দুর্লভ মুহূর্তে, তবে দেখা যাবে সে মুখও ক্ষতবিক্ষত। মুরলীধরের থপথপে চেহারার মধ্যে থেকে হয়ত বেরিয়ে আসবে একটি আস্ত সরীসৃপ।

শুধু এদের কথাতেই মহাভারত ফুরোয় না। আরও আছে, আরও অগুন্তি। পুণ্যবানদের কর্ণগোচর করবার মত অমৃত-সমান কাহিনীর রচয়িতা হয়ত তারা কেউই নয়, কিন্তু তারা চমকপ্রদ। রয়েছে পাষাণরূপিণী অহল্যা থেকে কলিযুগের কুন্তীর মডেল। বিনীতা থেকে লেখা। ইংরেজী প্রবাদ আছে নারীকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান কিন্তু তার আবিষ্কর্তা শয়তান স্বয়ং।

ইতিহাসের উৎস সন্ধানে ব্লাডহাউণ্ডের মত পায়ে পায়ে এগুলে কেঁচোর গর্ত থেকে সাপ বেরোবে অনেক। দরকার নেই সমুদ্রমন্থনে। পঁচিশ দিনের পাঁচমেশালী অভিজ্ঞতায় শোভন এইটুকু বুঝেছে যে, তার পরিচিত মুখগুলির প্রত্যেকটিই কোন ড্রামা-ক্লাইমেক্সের কাছ থেকে ছিটকে এসে পড়েছে, বুকে স্বতন্ত্র গল্পের টুকরো নিয়ে।

সিলিং থেকে স্খলিত মাকড়সার মত প্রত্যেকেই নিজের ভাগ্যের অদৃশ্য সুতোয় ঝুলছে। শোভন নিজেও তাই। একদিন একদিন করে পঁচিশটি দিন এবং পঁচিশটি রাত এই দেবনাগরী শহরে কেটে গেল তার। দুঃসহ গ্রীষ্মে, দুঃসহতর চিন্তায়। ক্ষেপিয়ে বেড়ানো রাত্রি, পাগলকরা মধ্যাহ্ন তার চারপাশে অতর্কিত ইচ্ছার ফাঁদ বিছিয়ে

ফেলেছে, ঘিরে ফেলেছে অসাবধান আলো-ছায়ার মায়ায়। একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি। নিশ্বাসে নিশ্বাস বাজে, পরাণে পরাণ। এই সূক্ষ্ম যন্ত্রণা এই বেদনার ভগ্নাংশগুলি, কাচের টুকরোর মতই রক্তমুখী।

জানলার সামনে ইজিচেয়ারটা পেতে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ভাল করে বসল শোভন। ঘরের আলো নেভানো। বাইরে তারায় ভরা আকাশ।

আঙুলের ফাঁকে তবু লাল আগুনের টুকরো জ্বলছে একটি বিষাক্ত ক্ষতের মত। শোভনের মন আজ উদ্বেল। সন্ধেবেলার ঘটনাটা ভুলতে পারছে না কিছুতেই। দু-হাতের আশ্রয়ের মধ্যে সেই এলিয়ে পড়া লেখা। কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। মুখখানা পাণ্ডুর। আতঙ্কে ঈষৎ কুঞ্চিত। এত কাছে এত নিবিড় করে লেখাকে কখনও দেখেনি এর আগে। শুধু একটা বিষণ্ণতা, একটা বেদনা।

খালাসি ডাক্তারের কুৎসিত মন্তব্য এখনও বাজছে কানের মধ্যে। খালাসি কথাটার গূঢ় অর্থ এতদিনে স্পষ্ট হল তার কাছে।

লেখার একটা ইতিহাস আছে। সেই অতীত ইতিহাসটা নিশ্চয়ই সুখের নয়। তার কিছু অংশ জেনে ফেলেছে ডাক্তার। এবং জেনে ফেলেছে যখন কথাটা ছড়াবে অনেক দূর। লোকনিন্দাকে আটকানো যায় না। ডাক্তারের মুখও চাপা দেওয়া যাবে না। কিন্তু একটি মেয়ের তাতে অনেক সর্বনাশ হবে হয়ত। লেখাকে প্রথম দিন থেকে মনে করতে চেষ্টা করল শোভন। এই পঁচিশ দিনের মধ্যে একদিনের জন্যেও এমন কোন আচরণ চোখে পড়ে নি তার যা থেকে তার চরিত্র সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগতে পারে। লেখা আসলে নিষ্পাপ। একটি নিরীহ লাজুক মেয়ে। জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে ও দায়ী হবে কেন। ওর সব কথা জানা যায় নি কিন্তু তা হলেও ডাক্তারের চোখ দিয়ে লেখাকে বিচার করতে কোথায় যেন বাধে শোভনের। মনে হয়, মনের মধ্যে পাপ থাকলে তা লুকোনো যায় না কিছুতেই।

লেখার মনে পাপ নেই, হয়ত পুণ্যও নেই! আসলে লেখা সেই জাতের মেয়ে যারা নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত লড়ে। লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত অবশ্য ফতুর হয়ে যায়। লেখাও গেছে। তার চোখে আজ আর স্বপ্ন নেই। দিন প্রতিদিনের বর্তমান ছাড়া আর কিছু নেই তার সামনে। সে নিঃস্ব। তার শেষ আশ্রয় বিনীতা। সে আশ্রয় ভেঙে যাবার ভয়ে সে সমস্ত গোপন করেছে। কিন্তু তার মনে কোন একটি ঘটনায় যে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল একদিন সেটাই চাপা থেকে থেকে নার্ভাস ব্রেক ডাউনের দিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে।

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শোভন। তাকে সব জানতেই হবে। এবং সেটা লেখার মুখ থেকেই শুনতে হবে।

নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে শোবার আয়োজন করছিল লেখা। বিছানায় বসে মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবছিল নিজের কথাই। এত সহজে কি করে এমন ভয় পেল সে, ভুল দেখল। এ রকম চললে আর বেশি দিন বাঁচতে হবে না! আজ অল্পের ওপর দিয়ে গেছে তাই রক্ষে।

লজ্জায় মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল একটা কথা ভেবে। ছি ছি, শোভনবাবুর গায়ের ওপর অমনভাবে গিয়ে পড়েছিল সে। তিনি কি না জানি মনে ভেবেছেন। যাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেনি আজ পর্যন্ত, তিনি আজ তাকে প্রাণ দিয়েছেন। জ্ঞান হারাবার পর নিশ্চয়ই লেখাকে তিনি একাই বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনতলার ঘরে। তখন না জানি কেমন ভাবে ছিল সে। সেই অবস্থায় সেই নির্জন ঘরে, কেউ তো আসে নি সঙ্গে সঙ্গে। শোভনবাবুকে নিজে হাতেই সব কিছু করতে হয়েছে সজ্ঞাহীন সেই

নির্লজ্জ দেহটা তখন তাঁরই বিছানার ওপরে পড়েছিল। ভাবতে লজ্জায় অন্ধ রঙ হয়ে যায় লেখা।

কিন্তু শোভনবাবুকে ভয় নেই তার, শুধু সঙ্কোচ ছাড়া। এতদিনেও লোকটিকে যদি না চিনে থাকে তবে তার মেয়ে জন্ম বৃথা। চোখের চাউনি দেখেই বুঝেছে লোকটি সত্যই ছেলেমানুষ। এত বিদ্বান হলে কি হবে, এত কথা বলতে জানলেই বা হয়েছে কি। ছেলেমানুষী ঘোচেনি লোকটার। ঘর গুছোতে গিয়ে একশ-বার প্রমাণ পেয়েছে তার।

ঘর গুছোতে গিয়ে অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেছে দিনে দিনে। একদিন একটি ছোট্ট চিঠি দেখতে পেয়েছিল একটি বইয়ের মধ্যে। পড়বে না পড়বে না করেও মেয়ে-সুলভ কৌতূহল দমন করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। তাছাড়া বিনীতাদির সঙ্গে শোভনবাবুর ঠিক যে কি সম্পর্ক কিছুতেই বুঝে উঠতে না পারায় মনের মধ্যে দারুণ একটা অস্বস্তি ছিল লেখার।

বিনীতাদি কোন দিন নিজমুখে কিছুই বলেন নি। তেমন মেয়েই তিনি নন। তবে তাঁর সেই ছোট্ট চিঠিটি অনেক কিছুই বলে দিয়েছিল সেদিন। শোভনবাবু এবাড়িতে আসবার পর থেকে বিনীতাদির স্বভাবে ব্যবহারে যে ছোটখাট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল এতদিন চিঠিটা তারই সূত্রধর হয়ে দেখা দিল। শোভনবাবুকে বুঝতে সেই একতরফা চিঠিটাই যথেষ্ট হয়েছিল লেখার কাছে।

চিঠিটা পড়বার পর কি রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল লেখা। খেয়াল ছিল না। শোভনবাবু কখন যে ফিরে এসেছিলেন টের পায় নি। সেদিনের কথা ভাবলে হাসিই পায়। তাকে বিনীতাদি বলে ভুল করেছিলেন শোভনবাবু। করবার কারণও ছিল। বিনীতাদির একখানা কাপড়ই পরেছিল সে, আর দাঁড়িয়েও ছিল দরজার দিকে পিছন করে।

এটা তাহলে তোমারই কীর্তি? আমি এতদিন—

কথাটা সম্পূর্ণ কর্ণগোচর হয়নি লেখার। তবু অস্পষ্টভাবে প্রথম অংশটুকু শুনেই ভীষণ চমকে গিয়েছিল। ভয়ে, বলতে গেলে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল চিঠি পড়ার অপরাধটা আর গোপন নেই। অনেকক্ষণ বোধহয় ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুখ ফেরাতে পারেনি লেখা। এক রকম আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কথা বলছ না কেন, হাতে হাতে ধরা পড়েছ সেইটেই বুঝি আমাকে এগিয়ে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে—

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিলেন শোভনবাবু। বুঝতে পেরেই বইটা টেবিলের ওপরে রেখে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল লেখা। সঙ্গে সঙ্গে শোভনবাবুর মুখের কি পরিবর্তন। প্রথমে ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই ব্যাপারটা চাপা দিয়েছিলেন কৌশলে।

ও, এ তাহলে তোমারই কীর্তি লেখা? আমি ভাবি কে রোজ রোজ ঘর গুছিয়ে যায়? আজ কিন্তু হাতে হাতে ধরা পড়েছ—

শোভনবাবুর গলার স্বর আর আগের মত জমেনি দ্বিতীয়বার। মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত বুলোতে বুলোতে হাসল লেখা। তারপর অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকাল। দরজায় কে যেন টোকা দিল জোরে জোরে। বিনীতাদি ছাড়া এ সময়ে কেউ তাকে ডাকবার নেই। কিন্তু বিনীতাদি এভাবে দরজায় টোকা দেন না কোন দিন। কে এল এইরাত্রে? না কি আবার ভুল শুনল সন্ধ্যাবেলার মত। কিন্তু ভুল হবে কি করে! এবার করাঘাতের শব্দ হল কপাটের ওপর।

উঠে গিয়ে দরজার ছিটকিনিতে হাত রেখে কাঁপা গলায় লেখা শুধোলো, কে?

লেখা, দরজা খোল।

এ যে শোভনবাবুর গলা! লেখা ভীষণ অবাক হল, সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাস বোধ করল।

দরজা খুলে লেখা বলল, কিছু চান নাকি?

না। গম্ভীর গলায় সংক্ষেপে জানাল শোভন। কেমন আছ এখন?

অনেক ভাল।

তাহলে একবার আমার ঘরে আসতে হবে তোমাকে। বিশেষ প্রয়োজন—

এরকম অসম্ভব প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিলনা লেখা। বিস্ফারিত চোখে শুধু তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ-না কোন কথা জোগালো না তার মুখে।

হাঁটতে হাঁটতে শোভন মুরলীধরের স্টুডিওর কাছে এসে পড়েছিল। খেয়াল হতেই ভাবল একবার উঁকি দিয়ে যায় দোকানে। বেশ কয়েকদিন দেখা হয়না মুরলীধরের সঙ্গে। ধর্মশালার আড্ডায়ও শোভন যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলতে গেলে। কদাচিৎ যায়, মুরলীধরের সঙ্গে কিন্তু দেখা হয় না।

কয়েকদিন আগে অবশ্য একবার অন্যমনস্ক মুরলীধরকে এই দোকানের সামনেই দেখেছিল। কিন্তু তাকে সে চিনতে পারেনি সেদিন।

বিনীতার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল সেদিন শোভন। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল মুরলীধর। একবার মনে হল যেন দেখতে পেয়েছে তাদের, নেমেও এল রাস্তায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই আচমকা ফিরে একেবারে দোকানের ভেতরে চলে গেল। সেদিনের ব্যবহারটা খাপছাড়া লেগেছিল শোভনের কাছে। ভাবল, আজ যখন এসেই পড়েছি, দেখে যাই লোকটাকে, কী ব্যাপার।

শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে মুরলীধরের বিচিত্র আহ্বান শোনা গেল, এই যে স্যার এল্ডার ব্রাদার, ভেতরে আসুন। পায়ের ধুলো দিয়ে যান একবার—

শোভনকে বড় সমাদর করে বসাল মুরলীধর। বলল, অনেকদিন দেখিনা, খবর সব ভাল তো ?

শোভন বলল, তা একরকম। আপনি ডাক্তারের খেলার আসরে যাননি আজ ?

নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মুরলীধর বললে, আমার অ্যাসিসটেণ্ট্ ছোকরার আবার ক-দিন থেকে অসুখ করেছে, কাজের চাপ···ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হয়ে ওঠেনা। আপনি একটু বসুন, আসচি—

উঠে বাইরে চলে গেল। বোধহয় কিছু ফরমাস করতে। ফিরে এল একটু পরেই।—ভাবছি কিছু দিনের জন্যে বাংলা দেশে ফিরে যাব স্যার। ভাল লাগছে না কিছু—

কেন, কি হল আবার আপনার ?

দেহ থাকলেই ব্যাধি হয় দাদা, মন থাকলেই মনোকষ্ট।

আপনার আবার মনোকষ্ট কি ! আপনি তো বেশ সুখেই আছেন।

হ্যাঁ, তা আর নেই ! মুখ বিকৃত করে মুরলীধর বলল, বহুত. সুখেই আছি দাদা।

কেন, কি ঘটল আবার !

আমার সেই বাঙালী বউটা, এল্ডার ব্রাদার। আবার বাড়াবাড়ি শুরু করেছে—

আবার মুরলীধরের দাম্পত্য প্রসঙ্গে কান পাততে বিষম আপত্তি ছিল শোভনের। তাড়াতাড়ি কথাটাকে চাপা দেবার জন্যে অন্যকথা বলল, কুমারভট্ট বাইরে চলে গেছেন জানেন বোধহয়। তিনি ফেরেন নি এখনও ?

কুমার ভট্টর নাম শুনে মুরলীধরের মুখের রেখাগুলো হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভট্ট ফেরেনি, ঘাড় নেড়ে জানাল মুরলীধর। তারপর বললে, একটা ব্যাপারে বড় খটকা লেগেছে বলেই বলছি

স্যার শোভনবাবু, কিছু কিন্তু মনে করতে পারবেন না ভাই। আমার কাছে কয়েকখানা ছবি আছে, আপনাকে দেখাব ?

স্বচ্ছন্দে ! যদি অবশ্য আপনার ব্যবসার কোন ক্ষতি না হয়।

আলমারির ভেতর থেকে অনেক হাঁটকে হাঁটকে একটা অ্যালবাম বার করে ফিরে এল মুরলীধর নিজের চেয়ারে। তারপর সাবধানে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, আপনার কাছে আমার কোন সিক্রেট নেই দাদা। সব বলেছি আপনাকে, সব বলব। ব্যবসার যদি কোন ক্ষতিও হত···এই যে, দেখুন তো আপনার সঙ্গে সেদিন ইনিই ছিলেন না ?

খানসাতেক পোস্টকার্ড সাইজের ছবি পাতা উল্টে এক নিশ্বাসে দেখে গেল শোভন। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের চেহারা পাল্টে গেল। বলল, পেলেন কোথায় এ-সব ছবি ?

মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার রুদ্ধ নিশ্বাসে বলল, তাহলে আমার অনুমানই ঠিক, মিলেছে তো ?

সেকথার উত্তর না দিয়ে রুক্ষ গলায় শোভন বলল, আগে বলুন, এগুলো আপনি পেলেন কোথায় ?

পেলাম কোথায় ? একটু হাসবার চেষ্টা করে মুরলীধর বললে, এই সব পাওয়াই তো স্যার আমার কাজ। ওয়াশ্ প্রিন্টের জন্য হাতে এলে অনেক সময় পছন্দসই ছবির বাড়তি কপি তৈরি করে রেখে থাকি। সবাই রাখে। প্রয়োজন মনে করলে বাইরে ডিস্‌প্লে করে। আমিও করি, তবে এ ছবিগুলি করিনি। বিশেষ কারণ ছিল তাই—

ছবিগুলো যেই তুলে থাকুক, খুব অজ্ঞাতসারে নিশ্চয়ই তোলেনি। সদ্যস্নাতার যে অসম্বৃত বেশবাসের চিহ্ন ধরা পড়েছে ক্যামেরার চোখে, তা ক্যামেরার অতর্কিত ছোবল মনে হয় না।

শোভন জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে দেখে মুরলীধর ইতস্তত করে বলল, আউট করবেন না স্যার, তাহলে বড় বিপদে পড়ে যাব।

ক্যাঙ্গারু সাহেবের জখম ক্যামেরার পেট থেকে এই ছবিগুলো পাওয়া গিয়েছিল দাদা।

আচম্‌কা একটা শক্‌ খেল শোভন। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। অ্যাকসিডেন্ট : বিনীতার স্বামীর মৃত্যু, অ্যাকসিডেন্ট : কুমার ভট্টর পা হারানো, জখম ক্যামেরা, বিনীতার ঐ জাতীয় ছবি—সব মিলে তালগোল পাকিয়ে একটা গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করছে মাথার ভেতর। এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত। একের পর এক, ঘটনার স্রোত তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। প্রচণ্ড শব্দে একটা মোটর যেন ব্রেক কষল তার মাথার মধ্যে: চাকার তলায় কতকগুলো পরপর সাজান ঘটনা গুঁড়িয়ে গেল।

ওকি শোভনবাবু, এখনই উঠছেন কেন? বসুন, মালাই আনতে দিলাম যে—

হাতের ভঙ্গীতে সমস্ত কিছু নাকচ করে দিয়ে বলল, আজ থাক।

মুরলীধরের স্টুডিও থেকে অপ্রকৃতিস্থের মত বাইরে বেরিয়ে গেল শোভন।

রাত্রে খাবার পর নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে ছিল শোভন। বিনীতা এল। রোজই, একবার করে আসে এই সময়। রেকাবীতে মশলা সুপুরির টুকরো ইত্যাদি নিয়ে। হাতের সিগারেটটাকে অর্ধ-দগ্ধ অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শোভন। কুমার ইন্দ্রা-রিজিৎ-কে তুমি চেন নাকি বিনীতা, কি রকম চেন?

মুহূর্তের জন্যে বিনীতার মুখের হাসি দপ্‌ করে নিভে গেল। ম্লান হেসে বলল, চিনি। তবে তুমি যে রকম সন্দেহ করছ সেরকম চিনি না।

শোভন একটু দম নিয়ে কি যেন ভাবল। পরে বলল, আমি কোন রকম সন্দেহ করছি না। কতদিনের আলাপ তাঁর সঙ্গে এবং

কি ভাবে আলাপ হয় তাই জানতে চাচ্ছি মাত্র। তিনি যে বর্তমানে বেনারসেই আছেন তা জান ?

না। আজকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। দেখা করবার কোন প্রয়োজনও নেই। তিনি আমার স্বামীর ব্যবসাসূত্রে বন্ধু হতেন। শিলংয়ে থাকা কালে আলাপ হয়েছিল আমার সঙ্গে, তখন ঘন ঘন আসতেন। প্রায় গায়ে পড়ে আলাপ করতেন। সেটা মোটেই সুনজরে দেখতে পারেনি সে—কিন্তু ঐ যে বলেছি, ইন্দ্রবাবু ছিলেন ওর ব্যবসাসূত্রে বন্ধু। তাই মুখের ওপর কিছু বলতে পারত না, শুধু ভুগতে হত আমাকে।

কিন্তু তোমার নিজের কথাটা কি বল তো ?

সন্তোষের ঘৃণ্য সন্দেহের জবাব দেবার জন্যেই আমি এইভাবে মিশতাম। এইভাবে মানে, সন্তোষ বাড়িতে না থাকলেও ইন্দ্রবাবুকে বসতে বলতুম, কফি করে খাওয়াতুম। কারণ এটা জানতাম, সন্তোষকে লুকিয়ে আমি কিছু করছি না। তার চোখ কোথাও না কোথা থেকে আমাকে লক্ষ্য করছেই। সামনে না থাকলেও পিছনে সে আছেই। ইন্দ্রবাবুও ছিলেন পাগল মানুষ। সত্যি-কারের শিল্পীরা যেমন হয়···চূড়ান্ত পরিমাণে সেন্টিমেণ্টাল। বাড়া-বাড়ি করে বসতেন ছেলে মানুষের মত। কিন্তু আমি তাঁকে সাবধান করে দিতে পারিনি, বাধা দিতে কোথায় যেন বেধেছে। আর তাই প্রাণ হারাতে গিয়ে পা হারাতে হল তাঁকে—লুকবো না, সন্তোষ সুইসাইড করেছে, কেউ না জানুক আমার জানতে বাকি নেই। কিন্তু ইন্দ্রবাবুকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতেই চেয়েছিল—

কিন্তু ছবিগুলোর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না শোভন।

তোমার নিজের কোন দুর্বলতা—কিছু মনে করো না—বন্ধু হিসাবে জানতে চাইছি ?

শোভন!—শ্লেষভরা গলায় বিনীতা বলল, মেয়েদের মনের কোন রাফ-খাতা নেই। তারা একেবারেই পাকা খাতায় তোলে,

বুঝেছ? তার জন্যে হয়ত বিলম্ব হয় অনেক, কিন্তু বিলম্বে তার কিছুই আর পাল্টায় না। প্রথমই তাদের শেষ। বিশ্বাস করবার ক্ষমতা তোমার নেই, জানি।

বিনীতা তাহলে কি বলতে চায়? শোভন রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবল। এই যদি তার শেষ কথা, তার মনের কথা, তাহলে এভাবে বলছে কেন। মুখ ফুটে তো বলতে পারত এতদিন। আগে যা হবার তা হয়েছে, হয়ে চুকে বুকে গেছে। এখনও তার ধুয়োয় আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকবার কি মানে হয়।

কিন্তু আজকের কথায় বিনীতা শুধু আহত হয়নি, অপমানিতও হয়েছে। তার মুখের চেহারা দেখে শোভনের বুঝতে বাকি থাকল না। কথা যোগাল না তাই অনেকক্ষণ। বিনীতা রেকাবীটা টিপায়ের ওপরে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, শোভন পিছন থেকে তার একটা কাঁধে হাত রাখল।

দাঁড়িয়ে পড়ল বিনীতা। মুখ না ফিরিয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, কি?

অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তাই যদি হয়, এই মিথ্যের মধ্যে পড়ে আছ কেন তুমি, বিনীতা? রস নেই, কোন রস নেই এই পাথরের স্তূপের মধ্যে। এখানে থাকলে তুমি ধীরে ধীরে মরে যাবে বিনীতা, বিনীতা, মরে যেতে শুরু করেছ—। শুধু স্মৃতিজীবী হয়ে সমস্ত জীবনকে ভুলিয়ে লাভ কি? অনেক, অনেক-গুলো বছর চলে গেছে হয়ত, কিন্তু আমরা এখনও ফুরিয়ে যাইনি, এখন আরও অনেকগুলো বর্ষা-শরৎ-বসন্ত ঋতু আমরা বাঁচবো, সেটাই বা কম কি? একদিন তুমি আমাকে ডেকেছিলে, সেদিন ঠাট্টা করনি নিশ্চয়। আজ অনুরোধ রাখতে এসেছি তোমার সেদিনের —তোমার যদি সময় হয় আজ আমারও হবে বিনীতা?

এমন অপ্রকৃতিস্থ গলায় শোভন কখনও কথা বলেনি, আজ কি হয়েছে তার! পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বিনীতা।

বোধহয় বিস্ময়ে বধির হয়ে গিয়েছে তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। পা টলছে, হয়ত এক্ষুণি পড়ে যাবে সে। তাড়াতাড়ি দরজার কপাটটা ধরে ফেলল হাত বাড়িয়ে। অস্বাভাবিক গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে ছাড়ো, আমাকে ছেড়ে দাও শোভন,… যেতে দাও আমাকে। তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না, বিশ্বাস করতে পারছি না—আমাকে একটু সময় দাও, একটু সময়…

স্খলিত পায়ে বিনীতা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে গেল নিচে! অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ল: সময়! অন্য কিছু চাওতো দিতে পারি. সময় কোথায় পাব! আশ্চর্য, সমস্ত কিছু বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে আসে! মানুষের জীবনে অতীতই আসে ভবিষ্যতের ছদ্মবেশ পরে। কেউ তাকে চিনতে পারে, কেউ পারে না। স্মৃতি আর আকাঙ্ক্ষা, অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝখানে একটি সঙ্কীর্ণ বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ।

শোভনের হঠাৎ কেমন আশঙ্কা হল, একটা ভয়। স্থাণুর মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে দোতলায় নেমে গিয়ে বিনীতার ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

দরজা তখন ভেতর থেকে বন্ধ। কপাটের ওপরে হাত রেখে বুঝতে পারল। একপাশে একটি ছোট জানলা। উঁকি দিল শোভন। কিন্তু ঘরের সবটা এ জানলা দিয়ে দেখা যায় না। খাটের শিয়রের একটুখানি দেওয়াল মাত্র দেখা যায় ওপাশের। আর খাটের একাংশ। বিনীতাকে দেখা গেল না। শুধু চাপা কান্নার মত অস্পষ্ট গোঙানী কানে ভেসে এল। ঘরের মধ্যে কি যে হচ্ছে বোঝা গেল না। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে গেল শোভন। সাদা ধবধবে দেওয়ালের বুকে একটি কাঁটা বিঁধে আছে, একটি পেরেক। কাঁটাটা দেখে মনে পড়ল ছবিটা

নেই, সেই ফটোগ্রাফটা। সন্তোষের এনলার্জ করা ছবিটা। অথচ শোভন ভাল করেই জানে, একটু আগেও সেটি ওখানেই ছিল।

বুঝতে বাকি রইল না কিছু। সংস্কারের ওপরে উঠতে পারেনি বিনীতা। তার মনের মধ্যে যে অন্তহীন দ্বিধা, তার উৎসটা আবিষ্কার করে মনে মনে আহত হলেও শোভনের বুকের ভেতরটা হাল্কা হয়ে এল ধীরে ধীরে।

বিনীতা, সময় বেশি নেই হাতে। দু-চার লাইনে তোমাকে শেষ কথা বলে যাই যাবার আগে। তোমার ছোট নিমন্ত্রণটি শেষ পর্যন্ত যে রক্ষা করতে পেরেছি সেজন্যে আমি আনন্দিত। কয়েকদিন বেশ কাটল তোমার এখানে। এবার যাবার পালা। এসেছিলাম দুপুরের খররৌদ্র মাথায় করে, একাএকা। সেদিনও সেই আসার মুহূর্তে তোমার দেখা পাইনি। আজ রাত্রের অন্ধকারকেই শিরোধার্য করে চলে যাচ্ছি চুপিচুপি, হয়ত কাপুরুষের মত, কিন্তু একা নয়। তুমি আমাকে যাই ভাব বিনীতা, বিশ্বাস শুধু করো যে এ ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। তোমার সোনার তরীতে আমার জায়গা হল না কোন দিনই, জীবন যৌবনের ভরা ফসল তুলে দিলেম তোমার নৌকোয় তার বদলে।

যাকে তুমি ঘৃণা করেছ মনে মনে, সেই জয়ী হয়েছে শেষ পর্যন্ত। যাকে ভাল বেসেছো, এবার হয়ত তাকে ঘৃণা করতেও পারবে, সব কিছু জানবার পর। সন্তোষ তোমাকে মৃত্যুর মূল্য দিয়ে কিনেছে। তুমি তাকে ফেরাতে পারনি শেষ পর্যন্ত। মুখে যতই বল, সন্তোষের দাঁত তোমার বুকের মধ্যে কোথাও বিঁধে নেই, আমি জানি। তার বদলে সেই দূরের মানুষটার এনলার্জমেণ্ট দেখতে পেয়েছি তোমার বুকের মধ্যে। আমি কাপুরুষ, আমি তোমাকে মৃত্যু দূরে থাক, জীবনের মূল্যটুকুও দিতে পারিনি।

ভেবো না অভিমানের তাড়নায় এভাবে আমি ফিরে যাচ্ছি। একদিন তুমি যেভাবে ফিরে গিয়েছিলে। তুমি তো ঠিক এই জায়গা থেকেই ফিরে গিয়েছিলে। আমি কিন্তু বিন্দুমাত্র অভিমান

মনের মধ্যে না নিয়েই ফিরে যাচ্ছি। কাজ্জি ফুল কুড়োতে এসেছিলাম, এসে কিন্তু লাভই হল। মালা পেয়ে গেলুম। মানুষের জীবনে অনেক দুঃখ আছে, দুর্ঘটনা আছে, সামাজিক কলঙ্কও আছে। কিন্তু মানুষ তাতে ছোট হয়ে যায় না। কেউ নিজেকে ছোট ভাববে, কলঙ্কিত ভাববে, নিঃস্ব ভাববে, এ আমি সহ্য করতে পারি না। কীটদষ্ট হলেও ফুল ফুলই থাকে। আমি সেই কথাই বুঝতে এবং বোঝাতে চলেছি। হয়ত প্রথম থেকে গড়তে হবে আবার জীবন, শুরু করতে হবে শুরুরও আগে থেকে। আমি তাতেও রাজি আছি।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই চুপি চুপি চলে গেলাম আজ। তুমি আর পিছু ডাকবে না জানি। এই আমার শেষ চিঠি! আমার মৃত্যুকে ভুলে যেও।

শোভনের নামটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। চোখে জল এসে গেছে বিনীতার। ভোর রাতের ঘুম জড়ানো অন্ধকারে ঠাকুর ঘরে প্রদীপের আলোয় আরও একবার শোভনের চিঠিটা পড়তে চাইল বিনীতা। কিন্তু পারল না।

ছুটতে ছুটতে শোভনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা হাট করে খোলা। সুইচ টিপল। শূন্যঘর খাঁখাঁ করে উঠল যেন। সুটকেশটা নেই, হোল্ড অলটাও। টেবিলের ওপর থেকে বইগুলোও অদৃশ্য। সুইচে হাত রেখেই দাঁড়িয়ে রইল ঝাপসা চোখে বিনীতা।

অন্ধকার-তরল মেঘের আড়াল থেকে হাত বাড়াল বিনীতা। সব যেন চলে যাচ্ছে তার হাতের বাইরে। এই শেষ রাতের আয়ুর মত সব স্বপ্ন ফিকে হয়ে আসছে। অন্ধ-বধির বাড়ির দেওয়ালটা আড়াল করে দিল বাইরের জগৎ থেকে বিনীতাকে। যে দেওয়াল

ক্রমশ গ্রাস করছে তাকে, একাকার করে দিয়েছে, নিঃসাড় নিশ্চেতন প্রাণহীন পাষাণে রূপান্তরিত করেছে অহল্যার মত। যে দেওয়ালটা শূন্য, যে দেওয়ালটা ফাঁকা, যে দেওয়াল থেকে ফটোগ্রাফেরা পলাতক, এক এক করে। কিন্তু কাঁটা! দেওয়াল না ভাঙলে তো কাঁটার দাগ যায় না।

ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটল। নিচে নেমে এল বিনীতা শ্রান্ত পায়ে। রান্নাঘরে উঁকি দিল। আঁচ পড়েনি আজ এতক্ষণেও। হঠাৎ মনে পড়ল নতুন করে। লেখাও নেই, সে চলে গেছে।